চতুর্থ অধ্যায়

বরাক উপত্যকার লোককথায় সতীন দ্বন্দ্ব ও বিমাতা চরিত্র

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় বরাক উপত্যকায় প্রচলিত লোককথায় প্রতিফলিত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর পরিবার ও সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে নারী। কবি নজরুল বলেছেন—

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপ তাপ বেদনা অশ্রু বারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।।"[৯]

পরিবার ও সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম। নারীর বিভিন্ন রূপ- জননী, জায়া, কন্যা ইত্যাদি। নারীর কামনা বাসনার সবচেয়ে প্রথমেই থাকে স্বামী আর সন্তানের মঙ্গল কামনা। তথাপি এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে নিজের অধিকার আদায়ের জন্য, সম্মান আদায়ের জন্য লড়াই করতে হয়। প্রতিবাদ করতে হয়। কেননা নারী কখনো পিতা, কখনো স্বামী আর কখনো সন্তানের উপর নির্ভরশীল। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা তাই বলেন যে এই সমাজে মেয়েরা মেয়ে হয়ে জন্মায় না। ধীরে ধীরে সমাজই তাকে নারী করে তুলে। নারী কখনো দেবী দুর্গা, কালী, চণ্ডী, লক্ষ্মী, সরস্বতী আবার কখনো সতী, সাবিত্রী, সীতা। এই সমাজে মেয়েদের পোষাক থেকে শুরু করে নারীর বিচরণের জায়গা কতটুকু তা ঠিক করে দেয় সমাজ। বিভিন্ন শাস্ত্র গ্রন্থেও নারী সম্পর্কে অনেক নিয়ম নীতি-আদর্শ তথা বিধিবিধান তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মেয়েদের আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয় একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে। যেখানে আবদ্ধ হয়ে থাকে মেয়েদের সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা, হাসি-কান্না, কামনা-বাসনা সমস্ত কিছু। অথচ মানব সভ্যতার গোড়াপত্তনে পুরূষের তুলনায় মেয়েদের অবদান কোন অংশে কম নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে কৃষি সভ্যতার শুরু মেয়েদের হাত ধরে। পরিবার ও সমাজ গঠনে মেয়েদের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। লোকসংস্কৃতির জগতেও মেয়েদের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। কেননা লোকসংস্কৃতির চর্চায় মেয়েদের স্থান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। লোকসংস্কার, লোকরীতি, লোকবিশ্বাস, ব্রত-পার্বন ইত্যাদির সঙ্গে মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা পুরুষের তুলনায় বেশি। লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও মেয়েদের অবদান ও ঘনিষ্ঠতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যেমন- মা, পিসী, দিদি, দিদা, ঠাকুরমা নিজের ও পরিবারের সন্তানদের মন ভোলানোর জন্য, ঘুমপাড়ানোর জন্য ছড়া ও লোককথা শুনিয়ে থাকেন। অনেক সময় নিজেরাও ছড়া তৈরি করেন। ফলে তাদের মনের সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণা-ভালবাসার কথা ব্যক্ত করার মাধ্যম হিসেবে এই মৌখিক সাহিত্য এক অন্যতম উপাদান বলে বিবেচিত হয়। যেমন মেয়েরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বহু ছড়া প্রবাদ ধাঁধা ইত্যাদির সৃষ্টি করে থাকেন। ফলে দেখা যায় যে লোকসাহিত্যে মেয়েদের ভূমিকা যেমন ধারক ও বাহকের, তেমনি স্রষ্টারও। আর এই ভাবে লোকসাহিত্যে এক বিশাল জায়গা জুড়ে থাকে নারী এবং তাদের জীবন কথা। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় এর অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়।

লোকসাহিত্যের এক বিশেষ শাখা ছড়া। ছোট শিশুর মন ভুলানোর জন্য এবং ঘুমপাড়ানোর জন্য মা, মাসি, ঠাকুরমা, দিদিমারা ছড়া শুনিয়ে থাকেন। শিশুর মন ভুলানোর জন্য ঘুমপাড়ানির ছড়া আরও বিভিন্ন বিষয়ের ছড়া রয়েছে। শিশুদের কল্পজগতের বাইরেও মেয়েদের সুখ-দুঃখের নানা চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় বাংলার ছড়ায়। যেমন- আগে মেয়েদের খুব কম বয়সে বিয়ে হয়ে যেত। মেয়েদের যখন খেলাধুলা করার সময় তখনই তাদের চলে যেতে হত পরের বাড়িতে বৌ হয়ে। এর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা অঞ্চলের একটি ছড়া'য়—

"আয় লো পুলা-পুঁড়ি ফুল টুকানিত যাই।
যেমনি গেলাম ফুলটুকানিত এমনি আইল বিয়া।।
আর তো খেইল খেলতাম নাকো পরের ঘরে গিয়া।
পরের পুতে লইয়া যাইব ঢোলে বাড়ি দিয়া।।
পরের পুতে মারবে।
চুল ধইরা টানবে।।" [২]

শুধুমাত্র বিয়ে হওয়াই নয়, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যে স্বামীর অত্যাচারও সহ্য করতে হয়, এই কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় ছড়ার শেষ দুটি লাইনে।

কমবয়সের মেয়েদের যে অতি বয়স্ক তথা বৃদ্ধ লোকের সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর শোনা যায় এমনই আরেকটি ছড়ায়-

"বুড়াইয়া জামাই পুড়ইয়া খাইবাম লবণ মাখাইয়া।
জোয়ান জামাই ঘরে আনবাম তেল সিন্দুর দিয়া।
কন্যারে ডাক্যোনা আর আম গাছের তলে।
বুড়ইয়া ডামাই দেখলে আমার চিত্তের (কোথাও পিত্তের) আগুন জ্বলে।।"

বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি আসার পর বাপ-ভাইয়ের জন্য মেয়ের মন কেমন করতে থাকে। শ্বশুর বাড়িতে ঘরের সব দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে যখন হাপিয়ে উঠে তখন বোন ভাইকে অনুরোধ করতে থাকে নাইওয়র নিয়ে যাবার জন্য। বাপের বাড়িতে নাইওয়র যাবার এক নারী হৃদয়ের বেদনার কথা শুনতে পাওয়া যায় একটি ছড়ায়। যেমন-

"ও পারেতে কালো রং,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্‌।
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে।
এ মাসটা থাক্‌, দিদি কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্‌কি সাজিয়ে।।
হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।"

এইভাবে ছড়ায় মেয়েদের সুখ-দুঃখের বহু চিত্র ফুটে উঠে ছড়া মাধ্যমে। একই রকমভাবে প্রবাদেও মেয়েদের মনের সুখ-দুঃখের কথা খুব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। যেমন একটি বংলা প্রবাদে শুনা যায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর-

"ভাত দিবার মুরোদ নাই, কিলাইবার যম।"

অর্থাৎ স্বামীর অত্যাচারের কথা এখানে পাওয়া যায়। স্বামী তার কর্তব্য অর্থাৎ ভাত-কাপড় ইত্যাদির দায়িত্ব ঠিক ভাবে পালন করতে পারে না অথচ শারীরিকভাবে নির্যাতন করে মানে মারধর করে। এছাড়াও প্রবাদে বিভিন্নভাবে নারীর কথা পাওয়া যায়।

যেমন-

ক. 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'

খ. 'বাপ ভালা তার বেটা ভালা
মা ভাল তার ঝি।।'

গ. 'যে নারীর কলঙ্ক হয়
ডুব দিলে কি ধোয়া যায়।।'

প্রবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব চরিত্রের সমালোচনা। এখানে দেখা যায় নারী চরিত্রের সমালোচনা করে প্রবাদ রচিত হয়েছে। ছড়া, প্রবাদের মত ধাঁধায়ও নারী প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যেমন-

ক. 'কালো বউয়ের কপালে চিক
জামাই আইলে করে হিত।' (মাসকলাই)

খ. 'দেখ্ছি দেখ্ছি খন্কে ভালে।
খন্কে ভাসে নয়নের জলে।।
হাতের পান জলে ফালায়।
কাইন্দা কুইট্যা বাড়িত্ যায়।।'

পুরুষ প্রধান সমাজে মেয়েদের অনেক সতর্ক হয়ে চলতে হয়। মেয়েদের অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। ফলে বুদ্ধির খেলা ধাঁধা রচনা করার সুযোগেও তারা নিজের মনের সুখ-দুঃখ, যন্ত্রণাকে ব্যক্ত করার প্রয়াস করেছে।

লোকসাহিত্যের বিশেষ শাখা লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতে লোকমানসের সুখ-দুঃখের কথা, আনন্দ, বিরহের কথা অতি সুন্দর ও সুললিতভাবে প্রকাশিত হয়। মেয়েদের সুখ-দুঃখের, বিরহের কথা লোকসঙ্গীতে বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। 'মেয়েলি গান', 'বারোমাসী গীত' বা 'বারমাস্যা', 'ব্রতসঙ্গীত' ইত্যাদিতে মেয়েদের মনের কথাই বিশেষভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। বলা হয় যে এগুলি মেয়েদের যেন নিজস্ব সম্পদ। এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন ধরনের লোকসঙ্গীতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও নানা অন্যায়ের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। শ্বশুর বাড়িতে গৃহবধূকে নানা অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তাই মেয়েদের কাছে শ্বশুর বাড়ি যেন এক যন্ত্রণার জায়গা। একটি লোকগানে গৃহবধূর মনের ক্ষোভের কথা শোনা যায়-

'বিড়ালে ভাঙ্গিল হাঁড়ি।
গাইল দিছে ননদ রাঁড়ি।।
গাইল দিছে শাশুড়ী অমেলা।
শ্বশুরঘর করাই বড়ই জ্বালা।।'

এইভাবে আরও বহু উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে মেয়েদের জীবন যন্ত্রণার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। শুধুমাত্র ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা এবং লোকসঙ্গীতই নয় মেয়েদের জীবন যন্ত্রণার কথা, সুখ-দুঃখের কথা, নারী মন তথা নারী জীবনের চিত্র আরও সুন্দরভাবে পাওয়া যায় লোককথায়। মেয়েদের সাংসারিক জীবনে বহু কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। স্বামীর ভালবাসার শক্তিতে একজন স্ত্রী সকল কঠিন পরিস্থিতির মোকবিলা করতে পারে। স্বামীর প্রেম সুধায় সকল দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারে। একজন স্ত্রীর কাছে স্বামী প্রেমই তার সবচেয়ে বড় আর অমূল্য সম্পদ। স্বামীর প্রেমকে তাই কোন অবস্থাতেই আর কারো সাথে ভাগ করে নিতে চায় না। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস যে না চাইলেও মেয়েদের কোন কোন সময় এই গরল পান করতে হয়। না চাইলেও সতীনের সাথে ঘর করতে হয়। যার ফলে সেই নারীর জীবনে যেমন অন্ধকার নেমে আসে তেমনি ছেলে-মেয়ের জীবনেও অনেক সময় নেমে আসে দুঃখের পাহাড়। সংসারে সৃষ্টি হয় অশান্তির।

এক সময় বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। একজন পুরুষ চাইলেই একাধিক বিয়ে করতে পারত। ফলে একাধিক নারীকে একজন স্বামীর ঘর করতে হত। এতে সুখের চাইতে সমস্যাই থাকত বেশি। বর্তমানকালে যদিও আইনানুযায়ী তা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। তথাপি আজকালও যে সতীন সংসারের উদাহরণ পাওয়া যায় না এমন নয়। এই সতীন সমস্যা মেয়েদের জীবনের এক বড় যন্ত্রণার দিক। মেয়েদের এই যন্ত্রণার কথা লোকসাহিত্যে অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায়। যেমন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

সংগৃহীত একটি ছড়ায় পাওয়া যায়-

'নিম তিতো, কল্লা (করলা) তিতো,
তিতো মাকাল ফল।
তাহা হইতে অধিক তিতো,
দুই সতীনের ঘর।।'

সতীনকে নিয়ে গড়ে উঠা একটি ধাঁধায় সতীনের প্রতি চরম বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

'বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন মরলে সবাই কাঁদে
বল দেখি কোন আত্মীয়ের মরণে কিন্তু হাসে।।'

এই ধাঁধাটির উত্তর হল সতীন। নারী হচ্ছে সংসারের অন্যতম অঙ্গ। যেমন প্রবাদে বলা হয়েছে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। অর্থাৎ সংসারের সকলের সুখ-দুঃখ সমস্ত কিছু দেখা-শুনার কর্তব্য থাকে নারীর উপর। সমস্ত কিছু তারা সুন্দর ভাবে চালিয়ে নিয়ে যান। এ নারীর এক মহৎ গুণ। কিন্তু সতীনের জ্বালা একটি নারীকে কতটুকু নিষ্ঠুর করে তুলতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় এই ধাঁধাটিতে। কতটুকু যন্ত্রণা পেয়ে একজন নারী এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠে যে আরেকজন নারীর মৃত্যু কামনা করে। এমনকী তার মৃত্যুতে আনন্দও প্রকাশ করতে চায়।

ধাঁধার মত প্রবাদেও সতীন দ্বন্দ্বের প্রকাশ পাওয়া যায়। যেমন-

'সতীনের ডাক নিশির ডাক
তিন ডাকে চুপ মেরে থাক।'

অর্থাৎ সতীনের ডাককে নিশির ডাক তথা অলক্ষ্মীর ডাকের সঙ্গে এখানে তুলনা করা হয়েছে। ঠিক একইরকমভাবে আরেকটি প্রবাদে পাওয়া যায়

'নিজের নাক কেটে সতীনের যাত্রা ভঙ্গ।'

অর্থাৎ সতীনের অমঙ্গল কামনা করা। এতে যদি নিজের ক্ষতি হয় তাতেও আপত্তি নেই। সতীনের প্রতি কতটুকু বিদ্বেষভাব থাকলে যে এমন ভাব জাগতে পারে তা সহজেই

অনুমান করা যায়। সতীন দ্বন্দ্বের চিত্র পাওয়া যায় আরও একটি প্রবাদে -

'দুই সতীনে ঘর।
খোদায় রক্ষা কর।।'

অর্থাৎ ঘরে সতীন থাকলে যে কি অবস্থা হতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই প্রবাদে।

সতীন দ্বন্দ্বের সমস্যা লোক-কবিকেও প্রভাবিত করেছে। সতীন ঘরে থাকলে কি জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তার চিত্র পাওয়া যায় একটি বাউলগানে। বাউল আব্দুল করিম লিখেছেন-

'রশিদ উদ্দিন ঘুরে ফিরে কাজ পাইলো না এই সংসারে
দুই সতীনের গান একটি বসিয়া বানায়
দুই সতীন যার ঘরে কথায় কথায় বিবাদ করে
আয়ু থাকতে স্বামী মরে দ্বন্দ্বেরই জ্বালায়
অল্প কিছু রাগ করে, দুই জনে দুই বিছানা করে
ঠেকলো স্বামী ভীষণ ফেরে, কার বিছানায় যায়।
যাবে স্বামী কার বাসরে, বসে বসে চিন্তা করে
টিক্কিয়া জ্বালায়, তামাক ভরে, নারিকেলের হুক্কায়।
গরু মরে দু'খানায়, মানুষ মরে দু'আশায়
এইভাবে রাত্রি কাটায় হুক্কায় আর চেঙ্গায়।।
দুই সতীনের দেখে দ্বন্দ্ব, রশিদ উদ্দিনের জবান বন্ধ
দুই সাদি গিয়া করো বন্ধ, কম শক্তি ওয়ালায়।
কম শক্তি যার গায়, উঠলে গিয়া দৌড়ের নায়
রাইতে দিনে জ্বর বায়, বাইছেরই ঠেলায়।।
লাঠি লইয়া খোলাখুলি মাথা ভাঙতে চায়।।'

সতীন থাকা ঘরে যে কি জটিল ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এর এক অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায় এই গানে। সতীন থাকলে ঘরে যে শুধু দুই সতীনের

মধ্যে লড়াইটা সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, পুরুষকেও যে কত জটিলতার মধ্যে পড়তে হয় তারও পরিচয় পাওয়া যায় এখানে। সতীন সমস্যা মেয়েদের জীবনে যে কত বড় অভিশাপের মত ছিল তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের সাহিত্যে। বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যগুলিতে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সতীন জ্বালার অতি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে। বণিক খণ্ডে দেখা যায় যে, খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে ধনপতি দনাই পণ্ডিতের মাধ্যমে খুল্লনার পিতা লক্ষপতির কাছে খুল্লনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। এই প্রস্তাব শুনে লক্ষপতি রাজী হলেও খুল্লনার মা স্পষ্ট ভাবে এই বিয়েতে অমতের কথা জানান। কারণ তিনি জানেন সতীনের সংসার কেমন হয়। তার মধ্যে যদি দু বোন হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। তাই তিনি স্বামীকে বলেন-

"প্রাণনাথ কেন হেন দিলে অনুমতি
হিতাহিত মনেগণ নাঞিলব কন্যা পণ
কেনি ঝিয়ে করাবে দুর্গতি।
পড়্যা সুন্যা হইলে শিশু ব্যয় করি নিজ বসু
কন্যা দিব দারুণ সতীনে।
লহনারে নাঞি জান হেন বাক্য মুখে আন
করুণা নাঞি তোমার মনে।
তোমরো বুঝাব কী লহনা ভাইয়ের ঝি
যদি তুমি দিবে তারে সতা
.....
খুল্লনা বান্ধিয়া গলে ঝাঁপ দিব গঙ্গাজলে
নাঞি দিব দারুণ সতীনে।" [১৯]

আসলে কবির নিজের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে ফুটে উঠেছে। কারণ উনারও দুই স্ত্রী ছিল। ফলে সতীন সমস্যা তিনি খুব কাছ থেকে অনুধাবন করেছেন।

দুই সতীনের সংঘাতের বিষয়টি লোককথায় পাওয়া যায় আরও বিস্তৃতভাবে। যেমন- 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'সাতভাই চম্পা' [২০] আর 'শীতবসন্ত' [২১] লোককথা দুটিতে সতীন দ্বন্দ্বের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। 'সাতভাই চম্পা' লোককথাটিতে দেখা যায় যে রাজার ছোটরানী সন্তান সম্ভবা হলে অন্য রানীরা তাকে খুব হিংসা করে। রাজাকে লুকিয়ে ছোটরানীর ছয় পুত্র এবং এক কন্যাকে মাটির সরা এনে পাশ গাদায় পুঁতে ফেলে। আর ছোট রানীকে বলে যে তার গর্ভে ইদুঁর আর কাঁকড়ার জন্ম হয়েছে। যার জন্য রাজা ছোট রানীকে তাড়িয়ে দেন। আর এতে অন্য রানীরা খুব খুশী হন। এক সতীন কোন সময় কোন আরেক সতীনের সুখ দেখতে পারে না তা এই লোককথাটিতে ছোট রানীর প্রতি অন্য রানীদের আচরণ থেকে বোঝা যায়। একই রকম চিত্র দেখা যায় 'শীতবসন্ত' লোককথাটিতে। এখানে দেখা যায় যে সুয়োরানী সতীন দুয়োরানীকে খুব হিংসা করে। আর তাই একদিন ছল করে দুয়োরানীর মাথায় ওষুধ টিপে দেয়। যার ফলে দুয়োরানী টিয়া পাখি হয়ে যায়। সতীন দ্বন্দ্বের এমন চিত্র পাওয়া যায় বহু লোককথায়। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত লোককথাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বরাক উপত্যকার লোককথায় নারী জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় সেখানে সতীন দ্বন্দ্বের দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বরাক উপত্যকার একটি বহু প্রচলিত একটি লোককথা হল 'মিষ্টি লাউ গাছ' (লোককথা সংখ্যা-১৩)। লোককথাটিতে দেখা যায় যে একজন লোকের দুই স্ত্রী। ফলে দুই সতীনে বিবাদ। ছোট বউ নিঃসন্তান হওয়ায় বড় বউ আর তার মেয়ের প্রতি ছিল তার খুব হিংসা। স্বভাবেও ছোট বউ ছিল খুব ঝগড়ুটে। ফলে সব সময় কারণে অকারণে বড় বউয়ের সাথে ঝগড়া করত। স্বামী তাকে বেশি ভালোবাসত বলে বড় বউয়ের সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। ছোট বউ বাড়ির কোন কাজ করত না, সমস্ত কাজ সে করাত সতীনকে দিয়ে। আর সমস্ত দিনে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যায় খেতে দিত ঠাণ্ডা ভাত। সকালে দিত বাসী ভাত। এত কষ্টের বিপরীতে বউয়ের সান্তনার জায়গা ছিল তার প্রিয় মিষ্টি লাউ গাছটি। লাউ গাছটিকে খুব যত্ন করত বড় বউ, খুব ভালবাসত। কিন্তু যেহেতু মিষ্টি লাউ গাছটি বড় বউয়ের প্রিয় তাই ছোট বউয়ের নজর পরে গাছটির উপর। আসল উদ্দেশ্য বড় বউকে কষ্ট দেওয়া। কারণ ছোট তাকে সতীন বলে তাকে

একটুকুও সহ্য করতে পারত না। সেজন্যেই তাকে সবদিক দিয়ে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেতে চায়। তাই মিষ্টিলাউ গাছে নতুন লাউ দেখে বড় বউ যখন খুব আনন্দিত হয় তখন ছোট বউ সব লাউ কেটে বিক্রি করে দেয় কাউকে না জানিয়ে। এতে বড় বউয়ের মনে খুব কষ্ট হয়। আর এই কষ্ট দেখে ছোট বউ আনন্দিত হয়। আরও দেখা যায় যে ছোট বউয়ের লাউ দিয়ে 'শুটকি' অর্থাৎ শুকনো মাছ খাবার খুব ইচ্ছা হলে সতীনের মেয়েকে পাঠিয়ে বাজার থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে আনে। কিন্তু রান্না করার পর বড় বউ আর তার মেয়েকে না দিয়ে ছোট বউ একাই সব খেয়ে নেয়। এতে মা মেয়ের মনে কষ্ট হয়। কিন্তু তাতেই যেন ছোট বউয়ের আনন্দ।

সতীন আর তার মেয়ের মনে এত কষ্ট দিয়েও ছোট বউয়ের মন ভরে না। তাই একদিন চুপি চুপি ফলবতী মিষ্টি লাউ গাছটিকে কেটে ফেলে ছোট বউ। প্রিয় লাউ গাছের এমন অবস্থা দেখে মা মেয়ের চোখে জল আসে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে যায় এক বৃদ্ধার কাছে 'জল পড়া' আনতে। বৃদ্ধার নির্দেশ মত বড় বউ মৃত লাউ গাছটিকে 'সাত গাছা' সূতা দিয়ে বেঁধে 'জল পড়া' দিতে দিতে মন্ত্র বলতে থাকে। লাউ গাছটি আবার জিইয়ে উঠে। প্রিয় গাছটিকে ফিরে পেয়ে বড় বউ আর তার মেয়ের আনন্দের সীমা থাকেনা। আর অন্যদিকে এদের আনন্দ দেখে হিংসায় জ্বলতে থাকে ছোট বউ। আর তাই একদিন বাসী ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খেতে দেয় বড় বউকে। সেই বিষ মেশানো ভাত খেয়ে বড় বউ মারা যায়। কিন্তু মারা যাবার পূর্বে বড় বউ যখন কষ্টে ছটফট করছিল তখন তার নজর পড়ে ছিল প্রিয় লাউ গাছটির উপর। আর লাউ গাছটিকে দেখে মনে মনে প্রার্থনা করেছিল যে সে যদি এই লাউ গাছটির মধ্যেই থেকে যেতে পারত তাহলে তার মেয়েকে সে সব সময় দেখতে পারত। আর তাই মারা যাবার পর বড় বউয়ের আত্মাটি থেকে যায় তারই প্রিয় লাউ গাছটির মধ্যে।

ঠিক একইরকম সতীন দ্বন্দ্বের চিত্র পাওয়া যায় 'বড় বউ আর ছোট বউ' (লোককথা সংখ্যা-১৪) লোককথাটিতে। এই লোককথাটির কাহিনিতেও একইরকমভাবে দেখা যায় যে একজন ব্যক্তির দুই স্ত্রী আর সেখানেও ছোট বউ তার সতীন বড় বউয়ের উপর হিংসাবশত অত্যাচার করে। ছোট বউ বড় বউয়ের ছেলে মেয়েকে সহ্য করতে পারে না।

মনে মনে তাই সুযোগ খুঁজতে থাকে ক্ষতি করার। ছোট বউ বড় বউকে ধাক্কা দিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দেয়। বড় বউ পুকুরের জলে পড়ে কচ্ছপ হয়ে যায়। আর এদিকে ছোট বউ বাড়িতে এসে বলল যে বড় বউ পুকুরের জলে পড়ে মারা গেছে।

কিছুদিন পর ছোট বউ যখন জানতে পারল যে বড় বউ পুকুরে কচ্ছপ হয়ে আছে তখন আবার তার মনে হিংসা জেগে উঠল। তাই এক বৈদ্যের সঙ্গে যুক্তি করে অসুস্থ হওয়ার ভান করল। আর বৈদ্য বলল যে কচ্ছপের মাংস খেলেই এই রোগ সেরে যাবে। কচ্ছপটিকে মেরে রান্না করার দায়িত্ব বড় বউয়ের মেয়েকেই দেওয়া হয়। উপায় না পেয়ে মেয়েটি তাই করল। আবার বড় বউয়ের ছেলে মেয়েকেই ভয় দেখানো হয় মাংস খাওয়ার জন্য। কিন্তু তারা সেই মাংস খায়নি। শেষে দেখা যায় নিজের আসল রূপ ফিরে পায় বড় বউ। আর রাজা সব বিষয় জানতে পেরে ছোট বউকে শাস্তি দেয়।

এই লোককথা দুটিতে সতীন দ্বন্দ্বের এক অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। লক্ষণীয় যে বেশিরভাগ কথাতেই দেখা যায় যে ছোট বউ বেশি অত্যাচারী হয়। কেননা ছোট বউয়ের প্রতি স্বামীর দুর্বলতা থাকে বেশি। একে তো সতীন তার উপর নিজের পুত্রসন্তান না থাকায় বড় বউয়ের প্রতি হিংসা আরো বেড়ে যায় ছোট বউয়ের। আর যৌবন দিয়ে ভুলিয়ে রাখে স্বামীকে। তবে শেষপর্যন্ত মৃত্যুর মুখ থেকেও ফিরে আসে বড় বউ। আর ছোট বউয়ের পরাজয় হয়। অর্থাৎ শেষপর্যন্ত গিয়ে সত্যের জয় হয়। অন্যায়কারী শাস্তি পায়। এখানে সতীন দ্বন্দ্বের সাথে সাথে নারী-পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। আসলে নারী তার স্বামীর ভালোবাসাকে কোন অবস্থাতেই অন্য আরেক নারীর সাথে ভাগ করতে চায় না। যখন অন্য আরেকজন এসে তার প্রেমে ভাগ বসাতে চায় তখন সে মেনে নিতে পারে না। তার স্বাভিমানে আঘাত লাগে। তার মনে হয় তার অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, স্বামীর উপর নিজের সম্পূর্ণ অধিকার বজায় রাখার জন্য যে কোন পর্যায়ে নেমে যেতে পারে। যে কোন অন্যায় কাজ করতে পারে। সংসারের হাজার দুঃখ-কষ্ট সে সহ্য করতে পারে, কিন্তু সতীনের জ্বালা কখনো সহ্য করতে পারে না। এটা তার আত্মসম্মানে আঘাত দেয়। তাই সতীনকে শেষ করে দিয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চায়। একটি পরিবারে বা সংসারে দুই সতীনের

দ্বন্দ্বের ফলে আরও একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়- 'বিমাতা চরিত্রের নিষ্ঠুরতা'। একজন নারী তার সতীনকে যেমন সহ্য করতে পারে না, তেমনি তার সন্তানদেরও দেখতে পারে না। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিশেষভাবে লোককথায় বিমাতা চরিত্রের নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলার বিভিন্ন লোককথাগুলির মধ্যে নারীর এই আত্মকেন্দ্রিকতা স্বার্থপরতা, নীচতা, দীনতা, প্রতিহিংসা পরায়ণতার ছবি পাওয়া যায় এবং এই সমস্ত চারিত্রিক বিশেষত্বই ফুটে উঠেছে 'বিমাতা' চরিত্রের মধ্যে। 'লোককথা' বা কাহিনিগুলোর মধ্যে কোন একটি চরিত্রের মাধ্যমে যে অবিচার, বেদনা, অত্যাচার, হিংসার ছবি দেখানো হয় তা আসলে প্রতীকের আড়ালে সমাজের রূঢ় বাস্তবের ছবি। কিন্তু এর বিপরীত চরিত্রের নারীও লোককথার জগতে রয়েছে প্রচুর। যেখানে নারী ভালো মা, ভালো বোন, ভালো স্ত্রী যারা নিজের পরিবারের মঙ্গলের জন্য সব দুঃখকেই মাথা পেতে বরণ করতে পারে। কোমলতা, সহানুভূতি, কর্তব্যবোধে সে এক অতুলনীয় গুণের অধিকারী থাকে। এমন নারীদের 'বুক ফাটে' তবু মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। অপরদিকে এর বিপরীতধর্মীরা সবসময় হিংসুটে, ঈর্ষাপরায়ণ, দাম্ভিক মানসিকতার। যারা নিজের স্বার্থপূরণের জন্য যে কোন কিছু করতে পারে। চরিত্রের এই দুই ধরণের ছবি আসলে নারী চরিত্রেরই ভালো মন্দের দুই দিক। ভালো, মন্দ নিয়েই এই পৃথিবী এই সমাজ সংসার। তাই যেখানে ভালো থাকবে সেখানে মন্দ থাকবে না, এমনটা হতে পারে না। লোককথাগুলি ভালো মন্দের এই দুই দিককেই কাহিনিতে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। বাস্তব জীবন থেকেই এগুলো রসদ পেয়েছে নতুন নতুন কাহিনি গড়ার। বাল্য বিবাহ, কৌলিন্য প্রথার নাগপাশে বন্দী সমাজের বিভিন্ন চরিত্র লোককথাগুলিতে জায়গা করে নিয়েছে। বিমাতা চরিত্রটি তার মধ্যে অন্যতম।

বিমাতা চরিত্রের নিষ্ঠুরতামূলক কাহিনি 'রামায়ণ', 'মহাভারত', বিভিন্ন ধরনের মঙ্গলকাব্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। সতীনের পুত্র-কন্যার প্রতি নিষ্ঠুরতা, বিদ্বেষ, অত্যাচার পৃথীবীর সমস্ত দেশের লোককথায় এমনভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যা অতি বিষ্ময়কর। যেমন 'রামায়ণ' মহাকাব্যে দেখতে পাওয়া যায় রাজা দশরথের দ্বিতীয় স্ত্রী কৈকেয়ী দাসী মন্থরার কু-পরামর্শে রাজার কাছে দুটি বর চেয়ে বসলেন। প্রথম বরে নিজ পুত্র ভরতকে রাজা

করার কথা বললেন ও দ্বিতীয় বরে সপত্নী কৌশল্যার পুত্র রামকে চৌদ্দ বৎসর বনবাসে পাঠানোর কথা বললেন। এতে রাজা দশরথের মন ভেঙ্গে গেল। কিন্তু কৈকেয়ী তার কথার অটল রইলেন। সপত্নীর পুত্রের উপর রানী কৈকেয়ী চরম হিংসা পরায়ণ হয়ে তাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠেলে দিলেন বনবাসে। এতে তার স্বামী রাজা দশরথের মনের কষ্টকে তিনি গুরুত্ব দেননি। রানী কৈকেয়ী মা হওয়া সত্ত্বেও সতীনের পুত্রের প্রতি তার মাতৃত্ব মমত্ব উধাও হয়ে গেল। অপরদিকে 'মহাভারতে' সপত্নী মাদ্রীর ছেলে নকুল ও সহদেবকে মাতা কুন্তী নিজের তিন ছেলে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের মতই সমান মমতা করেছেন, সমানভাবে ভালোবেসেছেন। বাস্তব সমাজেও এই দুই ধরনের বিমাতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

লোককথাগুলোতে স্থান করে নেওয়া সৎ মা বা বিমাতা চরিত্রটি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই খুব নিষ্ঠুর। স্বামীর সোহাগ বিভাজিত হচ্ছে এ সত্য নারী সহ্য করবে কি করে। তার ফল ভোগ করতে হয় সপত্নীর সন্তানকে। বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত লোককথায় এর সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। আসলে লোককথার কথক থাকেন দিদিমা-ঠাকুরমারা। তাদের সতীনের সংসার করতে হয়েছে, সৎমায়ের নিষ্ঠুরতা, গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। ফলে জীবন সায়াহ্নে নাতি-নাতনিদের কাছে জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা তারা লুকোতে পারেন না। জীবন যন্ত্রনার বাস্তব দলিল তাই লোককথার আকারে তাদের মুখ দিয়ে বেরোয়। লোককথা আসলে লোকমনের নির্মল দর্পণ। মানুষের মনকে দেখা যায় না। কিন্তু লোককথা এমন একটি মাধ্যম যার মধ্য দিয়ে লোকমানস তার অবদামিত ভাবনাগুলোকে প্রকাশ করেছে। তাই বলা যেতেই পারে যে লোককথা হল মনেরই প্রতিবিম্ব। তাই লোককথার খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সতীন বিদ্বেষ, সৎমার ঈর্ষাকাতরতা অত্যাচারের নাগপাশে বন্দী সমাজ। বাংলার বিভিন্ন লোককথায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'সাতভাই চম্পা' লোককথাটিতে দেখা যে এক রাজার সাত রানী। রানী সন্তানসম্ভবা হওয়ায় অন্য রানীরা জ্বলে পুড়ে মরে। একে একে ছোট রানীর সাত ছেলে ও এক মেয়ে হল। অন্য রানীরা সবাইকে পাঁশগাদাতে পুঁতে ফেলল। রাজার কাছে তারা বলে- ছোটরানী ইঁদুর আর কাঁকড়ার জন্ম দিয়েছে। রাজা দুঃখে ছোট রানীকে

তাড়িয়ে দিলেন। সেই ছেলে-মেয়ে পাঁশ গাদায় সাত ভাই ও এক পারুল বোন হয়ে ফুটেছে। অবশেষে সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা জয় করে সাত রাজপুত্র পারুল বোন আর ছোটরানী রাজপুরীতে পৌঁছতে পেরেছিল।

লোককথাটিতে বিমাতা বা সৎমার বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পরায়ণতা চরম আকার ধারণ করেছে। সন্তানহীনা নারীর মানসিক যন্ত্রণা খুব কষ্টকর ও অসহনীয়। তাই সে তার সপত্নীর সন্তানদের সহ্য করতে পারে না। এরজন্য সে হয়ে উঠে ভয়ংকর। যে কোন বিনিষ্টকারী কাজ করতেও সে পিছপা হয় না। গল্পে ছোট রানীর সন্তান সম্ভাবনা রাজার বড় রানীদের প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তুলেছে। নারীর পূর্ণতা আসে তার মাতৃত্বে। সন্তান না থাকার ফলে বড় রানীরা খুব অসুখী। তাই যখন ছোটরানীর সন্তান হল তখন তারা তা সহ্য করতে না পেরে ফুলের মত শিশুগুলোকে পুঁতে ফেলতে পেরেছে। লোককথাটিতে সতীনের সন্তানদের প্রতি বিমাতার নিষ্ঠুরতার এবং অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিমাতার চরম অত্যাচারের কাহিনি 'শীত বসন্ত' লোককথাটিতেও লক্ষ করা যায়। 'শীত বসন্ত'-র গল্পেও দেখা যায় সুয়োরানী তার সতীন দুয়োরানীর দুই সন্তান শীত আর বসন্তের উপর অমানবিক অত্যাচার করে। সুয়োরানী একদিন নদীর ঘাটে দুয়োরানীর মাথায় ওষুধের বড়ি টিপে তাকে টিয়াপাখি বানিয়ে ফেলল। এরপর সুয়োরানীর ষড়যন্ত্রে শীত-বসন্ত বনবাসে যেতে হয়। সুয়োরানী তাদের মেরে ফেলার জন্য জল্লাদকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু জল্লাদ তাঁদের মারেনি, ছেড়ে দিয়েছিল। অবশেষে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দুয়োরানী ও শীত বসন্তের মিলন ঘটে।

সৎমা শীত-বসন্তকে সহ্য করতে পারত না। তাই নানান রকমের গঞ্জনা তাঁদের সহ্য করতে হত। তাদের প্রতি বিমাতার ছিল চরম বিদ্বেষের মনোভাব। সুয়োরানী নিজের ছেলেদের 'ঘিয়ে চপ চপ পঞ্চব্যঞ্জন' রান্না করে সাজিয়ে দিলেও দুয়োরানীর ছেলেদের দিয়েছে 'আলুন', 'আতেল', 'কড়কড়া ভাত', 'শাকের উপর ছাই'। সৎ মা সুয়োরানীর এমন ব্যবহার করতে একটুও হৃদয় কাঁপেনি। মনভরা জ্বালা পেটভরা হিংসে নিয়ে সে এমন আচরণ করতে পেরেছে।

'নীলকমল আর লালকমল'[২২] গল্পে দেখা যায় এক রাজার ছিল দুইজন রানী। দুই রানীর মধ্যে একজন হল রাক্ষসী। কিন্তু কেউ সেকথা জানত না। রাক্ষসী রানী সতীনের ছেলেকে খেতে চায়। ভালো রানীর প্রতিও তার বিদ্বেষ মনোভাব। সুযোগ বুঝে সে একদিন লক্ষ্মী রানীকে মেরে ফেলে। নিজের ছেলে সতীনের ছেলের সাথে থাকে বলে খেতে পারে না। এই দুই সন্তানের মধ্যে কোন বৈরী মনোভাব নেই। নিজ পুত্র সৎ পুত্রের সঙ্গ না ছাড়ায় রাক্ষসী রানী রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে। সতীন পুত্রকে রাক্ষসী রানী খেতে লাগল। নিজ পুত্র অজিত যেই তার মার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে তখন রানী রাগে দিশাহারা হয়ে তাকেও মুড় মুড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে।

গল্পটিতে দেখা যায় সৎ মা রাক্ষসী রানী এতই প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠেছিল যে সৎ ছেলের অনিষ্ট করতে গিয়ে সে রাগে দিকবিদিক শূন্য হয়ে নিজের ছেলেকেই খেয়ে ফেলেছে। সন্তানের সঙ্গে থাকে মায়ের নাড়ীর সম্পর্ক। কিন্তু হিংসের আগুন রাক্ষসী রানী নাড়ীয় বন্ধনকে ছিন্ন করে দিয়েছিল। সৎ ছেলের ক্ষতি করতে গিয়ে। মনের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে সে সবসময়ই বিষোদগার করেছে সপত্নীর ছেলের প্রতি।

বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত লোককথার মধ্যে বিমাতা চরিত্রের নিষ্ঠুরতার বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে। যেমন 'কাঁঠালপাখি' (লোককথা সংখ্যা-১১)। এর কাহিনিতে দেখা যায় যে সুখের সংসারে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করায় সৎ মায়ের আগমন ঘটল। সৎ মা মেয়েটিকে অনেক অত্যাচার করত। দিন দিন সৎ মায়ের অত্যাচার অবহেলা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। সৎ মা মেয়েটিকে খাবার দেয় না, কাপড় দেয় না। যৌবনে পা রাখার পর বিয়ে দেওয়ার কথাও ভাবে না। তাই মেয়েটি 'কাঁঠালপাখি'র ডাক শুনে পাখি হয়ে উড়ে চলে যেতে চায় আকাশে। লোককথাটিতে বিমাতার অকথ্য নির্যাতন, অবহেলার শিকার মেয়েটি পাখি হয়ে উড়ে চলে যাওয়ার মাধ্যমে খুঁজে নিতে চেয়েছে সমস্ত যন্ত্রণার থেকে মুক্তি। অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায় নাগা সমাজে প্রচলিত 'রঙ বেরঙের পালক' (লোককথা সংখ্যা-৩৭) লোককথায়। এই লোককথাটিতে দেখা যায় বিমাতার অত্যাচারে নিপীড়িত ছেলেটি পাখির মত আকাশে উড়ে বেড়াতে চায়। তাই সে বন্ধুদের কাছ থেকে রং বেরঙা কাপড় চেয়ে নিয়েছে। ক বছর পর পাখিরূপে ছেলেটি

সুন্দর সুমধুর সুর, ও রং বেরঙা পালক নিয়ে গ্রামের আকাশে উড়ে আসে। এই লোককথাটিতেও সেই একই রকম মুক্তির ভাবনা লক্ষ করা যায়। ছেলেটি রং বেরঙা পালক নিয়ে উড়ে চলে মনের আনন্দে। প্রথম কাহিনিতে দেখা যায় যে মেয়েটি সারাদিন বিমাতার সব ধরনের ফাই-ফরমায়েশ খাটে, তাদের সংসার চালানোর উপায় তিল পরিস্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে বিক্রির উপযোগী করে রাখে। কিন্তু তারপরও বিমাতার ভালোবাসা থেকে সে বঞ্চিত। একইভাবে দ্বিতীয় কাহিনিতেও দেখা যায় যে ছেলেটি সারাদিন জুম খেতে অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরও সৎ মায়ের অত্যাচার এবং অনাদরই তার কপালে জুটত। লোককথা দুটিতেই বিমাতার নিষ্ঠুরতার ছবি ফুটে উঠেছে। অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায় চাকমা সমাজে প্রচলিত 'বার্গিপাখির কাহিনি'[২৩] লোককথায়। এই লোককথাটির কাহিনিও প্রায় একইরকম— "একটি লোকের দুজন স্ত্রী। দুজনেরই রয়েছে একটি করে মেয়ে। মেয়েদের বয়স যখন দশ-বারো তখন হঠাৎ একদিন লোকটি মারা যায়। স্বামী মারা যাবার পর ছোট বউ সংসারের কর্তৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। বড় বউকে কুষ্ঠরোগী বানিয়ে একটি পৃথক ঘরে বন্দী করে রাখে। সতীনের মেয়েকে দিয়ে ঘরে সমস্ত কাজ-কর্ম করায়। মেয়েটিকে একা একা জুম খেতে গিয়ে কাজ করতে হয়। সৎ মায়ের অত্যাচারে, অবহেলায় মেয়েটি দিন দিন তার রূপ লাবণ্য হারাতে থাকে। নিষ্ঠুর সৎ মা তাকে ভালো করে খেতেও দেয় না। একদিন দুঃখিনি মেয়েটি জুম খেতে কাজ করার সময় এক ঝাঁক বার্গী পাখি তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকে। সে তাদের সঙ্গে উড়ে যাবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানায়। পাখিরা তাকে পালক উপহার দেয়। মেয়েটি সেই পালক স্পর্শ করতেই সে বার্গীপাখিতে রূপান্তরিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পাখিদের ঝাঁকের সাথে মিশে দূর আকাশে উড়ে যায়। খবর শুনে তার মা হা-হুতাশ করতে থাকে। এরপর বৎসরান্তে পাখিরূপী মেয়েটি গ্রামে উড়ে আসে। সে আকাশ থেকে তার মায়ের উদ্দেশ্যে একটি পালক ফেলে দেয়। সেই পালকটি শরীরে লাগতেই তার মায়ের কুষ্ঠরোগ ভাল হয়ে যায়। এরপর সে আরেকটি পালক তার সৎমায়ের উদ্দেশ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু তা সৎমার শরীরে লাগতেই সে অন্ধ হয়ে যায়। এবার বার্গী পাখিরূপী মেয়েটি অন্য পাখিদের সঙ্গে আকাশপথে অনেক দূরে চলে যায়।"

আলোচিত লোককথাটিতে পরিলক্ষিত হয় যে স্বামী মারা যাবার পর বিমাতা সংসারের কর্ত্রী হয়ে ওঠে এবং শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন করতে থাকে সপত্নী ও তার মেয়ের উপর। সারাদিন জুমে কাজ করার পর সামান্যতম মায়াও সৎ মায়ের কাছ থেকে পায় না সে। উপরন্তু বিমাতা তাকে খাবার পর্যন্ত দেয় না। কাহিনিটিতে দেখা যায় বিমাতা তার সৎ মেয়ের প্রতি একটুও মাতৃত্ব সুলভ আচরণ করে না। এর বিপরীতে কঠোর নির্যাতন করেছে।

লোককথা তিনটিতেই সৎমা বা বিমাতার অকথ্য নির্যাতন অত্যাচার-অবহেলার কথাই বর্ণিত হয়েছে। পারিবারিক জীবনে ঘটে চলা অশান্তি, নানা অন্যায়মূলক আচরণ, বিদ্বেষভাব ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে লোককথা তিনটিতে। শুধুমাত্র বাঙালি এবং নাগা জনগোষ্ঠীর লোকের পারিবারিক জীবনেই এমনটা ঘটত না, চাকমা জনগোষ্ঠীর পারিবারিক জীবনেও এই সমস্যা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চাকমা লোককথাটিতে। আসলে প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর সমাজে বহু বিবাহ প্রথাই এই সমস্যা বয়ে নিয়ে আসত। লোককথাগুলোতে তারই বাস্তব অবস্থার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। বিমাতার অত্যাচার সহ্য করা ছিল প্রায় অসম্ভব। যার জন্য লোককথা তিনটিতেই দেখা যায় যে সৎ মায়ের অধীনস্থ জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছে ছেলে-মেয়েরা। বিমাতার অত্যাচারে জীবন ছিল তাদের কাছে অভিশাপের মতো। বাংলা লোককথাটিতে দেখা যায় যে মেয়েটি সারাদিন ফাই ফরমায়েশ খাটার পরও সারাদিনে দুমুঠো খাবার আর পরার কাপড়টুকুও জুটে না। তাদের জীবন ধারণের উপায় তিল পরিস্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে বিক্রির উপযোগী করার পরও বিমাতার কাছে সামান্য মমতা তো পেতেই না উপরন্তু তার ভাগ্যে জুটত বঞ্চনা-লাঞ্ছনা। একইভাবে নাগা লোককথাটিও দেখা যায় ছেলেটি ভোর থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাঁটার পরও তার কপালে জুটত বিমাতার অনাদর অবহেলা। অনুরূপভাবে চাকমা লোককথাটিতেও মেয়েটি সারাদিন জুমের কাজ, ঘরের যাবতীয় কাজ করার পরও সৎমার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে সে রেহাই পায়নি। স্বাধীন সুন্দর জীবন যাপন প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য। তাই বাংলা লোককথার মেয়েটি, নাগা লোককথার ছেলেটি এবং চাকমা লোককথার মেয়েটি এই তিনটি চরিত্রই তাদের দুঃখ-

কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছে পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার মধ্যে। বিমাতার অনাদর অত্যাচারের নাগপাশের বন্ধনকে তারা ছিন্ন করতে চেয়েছে। পাখি যেমন মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে খোলা আকাশে যেদিকে ইচ্ছে উড়ে যেতে পারে ঠিক তেমনি যন্ত্রণাময় দুঃসহ জীবন থেকে বাংলা লোককথার মেয়েটি চেয়েছে কাঁঠাল পাখি হয়ে যেতে, নাগা লোককথার ছেলেটি রংবেরঙা পালক নিয়ে চেয়েছে দূর আকাশে উড়ে যেতে, চাকমা লোককথার মেয়েটি চেয়েছে পরিযায়ী পাখি হয়ে দূরদূরান্তে পারি দিতে। মুক্তির প্রতীক হিসেবে ধরা হয় পাখিকে। তাই বিমাতার অনাদর অবহেলা-অত্যাচারের শক্ত বন্ধনকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে তারা মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে চেয়েছে পাখি হয়ে। পাখি হয়ে নীল আকাশে বিচরণ করার মধ্য দিয়ে তার তৃপ্তি লাভ করেছে, খুঁজে পেয়েছে জীবনের সার্থকতা।

বিয়ে, সন্তানের জন্ম, সন্তানের লালন-পালন, কর্তব্য, ঘরকন্নার সুখ-দুঃখ, অশান্তি-আনন্দ প্রভৃতি প্রতিদিনকার জীবনের নানা নানা চিত্র লোককথায় প্রতিফলিত হয়। লোককথার যারা কথক তারা লোককথায় মধ্যে নিজেদের জীবনকেই যেন সেখানে খুঁজতে চেষ্টা করেন। ফলে নিজেদের মনের দুঃখ, যন্ত্রণাকে সেই লোককথার মাধ্যমে ব্যক্ত করে মানসিক শান্তি লাভের প্রয়াসও করে থাকেন। প্রচলিত অনেক লোককথাকে অনেক সময় নিজের মত করে তৈরিও করে নেন। আর তাই লোককথাগুলোর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ফসল বিমাতার নিষ্ঠুর অত্যাচারের চিত্রটিও স্থান পেয়েছে। বহুবিবাহ প্রথার ফলে দুই নারীর জীবন যেমন জটিল হয়েছে, তেমনি ভুগতে হয়েছে সেই পরিবারের সন্তান সন্ততিদের।

বরাক উপত্যকার অতি সুপরিচিত 'বড় বউ আর ছোট বউ' (লোককথা সংখ্যা-১৪) লোককথাটিতেও বিমাতার নিষ্ঠুরতার সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। লোককথাটিতে বিমাতার অত্যাচারে জর্জরিত সন্তানদের গল্পকে তুলে ধরা হয়েছে। লোককথাটিতে বিমাতার সতীনের সন্তানের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিমাতা ছোট বউ তার সপত্নী এবং সপত্নীর সন্তানদের ক্ষতি করার জন্য সব ধরনের কাজে লিপ্ত হয়েছে। বিমাতা বড় বউর মেয়ের প্রতি শুধু শারিরীক অত্যাচারই করেনি তাকে মানসিক নির্যাতন ও করেছে। কচ্ছপ রূপী বড় বউকে ছোট বউ যখন চিনতে

পারল তখন তাকে মারার জন্য সে অসুখের ভান করে বলল যে কচ্ছপের মাংস খেলেই তার রোগ সারবে। আর সেই কচ্ছপের মাংস রান্না করতে দিল বড় বউয়েরই মেয়েকে। তাকে ভয় দেখিয়ে বলে যে, যদি সে মাংস রান্না না করে তাহলে জ্বলন্ত উনুনের চুলার লাকড়ি দিয়ে তাকে পুড়িয়ে মারবে। কোন উপায় না পেয়ে সে রাজী হল। কিন্তু তার মার মাংস কেটে রান্না করতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। আবার সেই রান্না করা মাংস খেতে দেওয়া হয়েছিল তার ভাই ও তাকে। এরপর যখন পূর্ণ যুবতী মেয়েটিকে রাজা বিয়ে করতে চাইল তখনও বিমাতার অত্যাচার কিছু কমেনি বরং অত্যাচার অনেকটাই বেড়ে গেল। জ্বলন্ত লাকড়ির ছেঁকা দিয়ে সৎমা মেয়েটির হাত পুড়িয়ে ছিল। এই কাজ করতে সৎমার মাতৃত্বে একটুও বাধ সাধল না।এরপর যখন পূর্ণ যুবতী মেয়েটিকে রাজা বিয়ে করতে চাইল তখনও বিমাতার অত্যাচার কিছু কমেনি বরং অত্যাচার অনেকটাই বেড়ে গেল। জ্বলন্ত লাকড়ির ছেঁকা দিয়ে সৎমা মেয়েটির হাত পুড়িয়ে ছিল। এই কাজ করতে সৎমার মনে একটুকুও কষ্ট হল না। একজন নারী তার সতীনের প্রতি কতটুকু হিংস্র হয়ে উঠতে পারে এবং এর ফলে তার সন্তানদের উপর কতটুকু নিষ্ঠুর ও নির্মম অত্যাচার করতে পারে তা এই লোককথাটিতে অনুমান করা যায়। ঈর্ষাপরায়ণ সৎমা শুধু তার সপত্নীরই ক্ষতি করেনি তার সন্তানদের উপরও অসহনীয় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করেছে। ছেলেটি ও মেয়েটির মঙ্গল কামনা সে করেনি উপরন্তু তাদের ক্ষতি করার সব ধরনের প্রয়াস করেছে। বিমাতা চরিত্রের নিষ্ঠুর দিকটিই লোককথাটির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

বিমাতা চরিত্রের নিষ্ঠুরতার একইরকম চিত্র দেখতে পাওয়া যায় মনিপুরি 'শন্দ্রেম্বী আর চাইশ্রা',[২৪] ডিমাছা 'দুই রানীর কথা'[২৫] ও অসমীয়া সমাজে প্রচলিত 'তুলা আর তেজা' [২৬] লোককথায়। মনিপুরি লোককথায় দেখা যায় এক রাজপরিষদের কাহিনি।

"রাজপরিষদের ছিল দুই বউ। বড় বউয়ের নাম য়াংখুরেইমা আর ছোট বউয়ের নাম শাংখুরেইমা। বড় বউয়ের মেয়ের নাম শন্দ্রেম্বী আর ছোট বউয়ের মেয়ের নাম চাইশ্রা।

য়াংখুরেইমার মেয়ে শন্দ্রেম্বী ছিল অপূর্ব সুন্দরী। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যই নয় তার স্বভাবটাও ছিল ভারি মিষ্টি ও নম্র। তাই সবাই তাকে ভালোবসত। আর শাংখুরেইমার মেয়ে চাইশ্রা যেমন দেখতে ছিল কুৎসিত তেমনি কুটিল স্বভাবের। চাইশ্রা ও তার মা শন্দ্রেম্বী ও তার মাকে খুব হিংসা করত।

শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রার বাবার অকাল মৃত্যুতে তাদের পরিবারে নেমে এসেছিল চরম দারিদ্র। শেষ পর্যন্ত তাই দুই মা বন থেকে জ্বালানী কাঠ জোগাড় করে এবং 'লোং' দিয়ে খাল বিল থেকে মাছ ধরে। সেগুলো বাজারে বিক্রি করে কোন রকমে সংসার চালাত। এত কষ্ট করে বাঁচার সংগ্রামের মধ্যেও কী করে শন্দ্রেম্বী ও তার মার অনিষ্ট করা যায় চাইশ্রা ও তার মা সেই মতলবে ছিল।

একদিন শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রার মা 'লোং' নিয়ে বিলে মাছ ধরতে গেল। প্রতি 'খেপেই' শন্দ্রেম্বীর মার লোং-এ প্রচুর মাছ ধরা পড়ছিল। আর চাইশ্রার মার লোং-এ ধরা পড়ছিল সাপ। বেলা গড়িয়ে যাওয়ায় দুই সতীন বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। পথে পরিশ্রান্ত হয়ে এক আম গাছের নিচে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসে পড়ে দুজনে। গাছে অনেক পাকা আম রয়েছে দেখে চাইশ্রার মা শাংখুরেইমা গাছে উঠে পড়ল। বেছে বেছে পাকা ও সুস্বাদু আম পেড়ে শন্দ্রেম্বীর মার জন্য নিচে ফেলে দিল। সুস্বাদু আমগুলো খেয়ে শন্দ্রেম্বীর মা ভারী তৃপ্তি পেল। চাইশ্রার মা জিজ্ঞেস করল, "দিদি আমগুলো খেতে কেমন লাগছে?"

— ভারী স্বাদ। আরো কয়েকটি পেড়ে দাওনা।

— আরো সুস্বাদু আম পেড়ে দিচ্ছি তোমাকে।

এবার চোখ বোজে মুখটা হা করে উপরে তুল।

কথামতো শন্দ্রেম্বীর মা আমের লোভে চোখ বোজে মুখ তুলে হা করে রইল। চাইশ্রার মা এবার পাকা আমের পরিবর্তি তার কোমরে বাঁধা মাছের তুঙ্গোল এ থাখা সাপগুলো সতীনের হা করা মুখের উপর ঢেলে দিল। সাপগুলোর কামড়ে শন্দ্রেম্বীর মা তৎক্ষণাৎ মারা গেল। চাইশ্রার মা গাছ থেকে নেমে শন্দ্রেম্বীর মার মৃতদেহ টেনে নিয়ে জলে ফেলে দিল। আর তার মাছ ভরা তুঙ্গোলটি নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসে।

সৎমাকে একা ফিরতে দেখে শন্দ্রেম্বী তার মার খোঁজ নিল। সৎমা বলল, "তোর মাকে কত করে বলেছি দিদি, সন্ধ্যে হয়ে গেছে বাড়ি চল। না, সে কিছুতেই রাজি হল না। আরো নাকি মাছ ধরবে। তাই একা রয়ে গেল বিলে।"

মার ফেরার অপেক্ষায় শন্দ্রেম্বী বসে রইল। রাত গড়িয়ে গেল। তবু মা ঘরে ফিরল না। মায়ের ফেরার অপেক্ষায় বসে থেকে রাতে তার আর খাওয়া হল না। অনেক রাত অবধি বসে মার অপেক্ষা করে শেষে সে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু মায়ের চিন্তায় তার ঘুম এল না। সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগল। শেষ রাতে এক পলক ঘুমিয়ে পড়ল সে। সে স্বপ্নে দেখল মা তাকে বিলাপ করে বলছে, 'মামণি, তুই আমার ঘরে ফেরার অপেক্ষায় বসে রয়েছিস। এদিকে তোর সৎমা আমার মুখে পাকা আম ফেলে দেবার নাম করে তার তুঙ্গোল থেকে আমার মুখে সাপ ফেলে দিয়েছে। সাপের কামড়ে আমি মরে গেছি। আমার প্রাণ কচ্ছপ হয়ে বিলের জলে রয়েছে। ভোরে তুই একটি লোং নিয়ে বিলে এসে জলে খেপ দিবি। আমি কচ্ছপের রূপ নিয়ে তোর লোং-এ ধরা দেব। তুই এই কচ্ছপকে বাড়িতে এনে একটি জলপাত্রে পাঁচদিন জিইয়ে রেখে দিবি। পাঁচ দিনের মাথায় আমি তোর মা হয়ে আবার জিইয়ে উঠব।"

স্বপ্নের কথা মতো ভোর হতেই শন্দ্রেম্বী একটি লোং হাতে নিয়ে বিলে গিয়ে জলে খেপ দিতে লাগল। প্রথমে লোঙে একটি 'লেটা মাছ' ধরা পড়ল। "হে লেটা মাছ তোকে ধরার জন্য আমি লোং খেপ দিইনি। কচ্ছপের রূপ নেওয়া মাকে ধরার জন্যই খেপ দিচ্ছি।" এ কথা বলে সে লেটা মাছটাকে ছেড়ে দিল। তার লোঙে যে সব মাছ ধরা পড়ল সবগুলোকে ছেড়ে দিল সে। শেষে ধরা দিল কচ্ছপের রূপ নেওয়া তার মা। কচ্ছপটিকে কোমরে তার পরিধেয় ফানেক এ জড়িয়ে সবার চোখ এড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে এলো। লোং হাতে ঘরে ফিরতে দেখে কেমন মাছ ধরেছে সৎমা জানতে চাইল। "আমি ঠিকমতো লোং খেপ দিতে পারি না। তাই একটিও মাছ ধরা পড়েনি।" এ কথা বলে সে তার মাছের তুঙ্গোলটি উল্টিয়ে দেখাল তার কোমরের ফানেক জড়িয়ে রাখা কচ্ছপটি দেখে ফেলবে বলে বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। ভাগ্যিস এটি সৎমার চোখ এড়িয়ে গেল। 'যাও রান্না চড়াও গিয়ে।' এ কথা বলে সৎমা অন্যত্র চলে গেল। ঘরে ঢুকে কেউ দেখছে

না ভেবে শন্দ্রেম্বী তার ফানেকে জড়িয়ে আনা কচ্ছপটি বের করে জলপাত্রে ছেড়ে দিল। মনে মনে ভাবল বাঁচা গেল।

কিন্তু চাইশ্রা আড়াল থেকে সব কিছু দেখে ফেলল। তার মাকে সব কথা জানাল সে। "তাহলে তুই কাল সকালে শন্দ্রেম্বীদির জলপাত্র থেকে জল খাবে বলে বায়না ধরবি। জলপাত্র থেকে জল নিতে গেলে সেখানে যে কচ্ছপ আছে তা জানা হয়ে যাবে।" এ কথা বলে মা চাইশ্রাকে শিখিয়ে দিল। পরদিন সকালে চাইশ্রা মার শেখানো মতো শন্দ্রেম্বীর জলপাত্র থেকে জল খাবার জন্য আবদার করল। চাইশ্রার মা শন্দ্রেম্বীকে জল খাওয়াতে বলল। শন্দ্রেম্বী জল দিতে উঠতেই চাইশ্রা বায়না ধরল সে নিজের হাতে দিদির জলপাত্র থেকে জল নিয়ে খাবে। শন্দ্রেম্বী পড়ল মহাসংকটে। সৎমা বলল 'জেদি মেয়ে তো, কী আর করবে? দাও, নিজের হাতে জল খেতে দাওঁ।' এ কথার কী জবাব দেবে ভেবে না পেয়ে শন্দ্রেম্বী চুপ করে বসে রইল। এ ফাঁকে চাইশ্রা নিজেই দিদির জলপাত্র থেকে জল নিয়ে খেল আর জলপাত্র থেকে কচ্ছপটা তুলে আনল। তা দেখে খুশি হয়ে কচ্ছপটিকে রান্না করার জন্য চাইশ্রার মা শন্দ্রেম্বীকে বলল। নিরুপায় হয়ে সে কচ্ছপটিকে একটি জল ভরা হাঁড়িতে জ্যান্ত সেদ্ধ করতে শুরু করল।

আগুনের তাপে ক্রমে উত্তপ্ত হাঁড়ির জল কষ্ট পেয়ে কচ্ছপের রূপ নেওয়া শন্দ্রেম্বীর মা করুণ সুরে বলে উঠল, 'শন্দ্রেম্বী, তোর মার প্রাণ হাঁটু অবধি উঠে এসেছে।" এ কথা শুনে শন্দ্রেম্বী উনুনের জ্বলন্ত লাকড়িগুলো টেনে বের করল ও কাঁদতে লাগল। তার এই কাজ দেখে চাইশ্রা ছুটে গিয়ে মাকে জানাল। সৎমা দ্রৌড়ে এসে শন্দ্রেম্বীর গায়ে জ্বলন্ত লাকড়ির ছ্যাঁকা দিল। কাঁদতে কাঁদতে শন্দ্রেম্বী আবার উনুনে লাকড়ি ঠেলে দিল। কিছুক্ষণ পর উত্তপ্ত হওয়া হাঁড়ির ভেতর থেকে কচ্ছপটি বলে উঠল, "শন্দ্রেম্বী তোর মার প্রাণ কোমর অবধি উঠে এসেছে। শন্দ্রেম্বী চোখের জলে উনুন থেকে জ্বলন্ত লাকড়ির ছ্যাঁকা দিল। কাঁদতে কাঁদতে শন্দ্রেম্বী আবার উনুনে লাকড়ি ঠেলে দিল। কিছুক্ষণ পর উত্তপ্ত হওয়া হাঁড়ির ভেতর থেকে কচ্ছপটি বলে উঠল, 'শন্দ্রেম্বী তোর মার প্রাণ কোমর অবধি উঠে এসেছে। শন্দ্রেম্বী চোখের জলে উনুন থেকে জ্বলন্ত লাকড়িগুলো টেনে বের করল। চাইশ্রার মাও তৎক্ষণাৎ তার গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দিল। শন্দ্রেম্বী বাধ্য হয়ে উনুনে

আবার নাকড়ি ঠেলে দিল। হাঁড়ির ভেতর থেকে কচ্ছপটি আবার করুণ সুরে বলল, "শন্দ্রেম্বী, তোর মার প্রাণ বুক অবধি উঠে এসেছে। গলা অবধি পৌছে গেছে, এবার আমার সব শেষ হয়ে গেল রে। এভাবে শন্দ্রেম্বী চোখের জলে বাধ্য হয়ে কচ্ছপ রূপী তার মাকে সেদ্ধ করে ফেলল। সেদ্ধ করা কচ্ছপের মাংস সে খেল না। কিন্তু চাইশ্রা ও তার মা চেটেপুটে কচ্ছপের মাংস খেল। মাংসের হাঁড়গুলোকে সে পিছ দুয়ারে ফেলে দিল। রাতে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তার মা শন্দ্রেম্বীকে বলল- "শোন মামণি আমি যে কচ্ছপের রূপ নিয়েছিলাম এর হাঁড়গুলোকে সংগ্রহ করে কাপড়ে জড়িয়ে একটি বাক্সে মুখ বন্ধ করে সাতদিন রেখে দিবি। সাতদিনের মাথায় আমি আবার মানুষ হয়ে জিয়ে উঠব।" স্বপ্নে বলা মার কথা মতো শন্দ্রেম্বী সব করল। কিন্তু ছ'দিনের মাথায় বাক্সের ভেতর কাপড়ে জড়িয়ে রাখা হাড়গুলোর কী অবস্থা হল তা দেখার জন্য শন্দ্রেম্বীর বড় কৌতুহল হল। তাই নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বাক্সের মুখ খুলে যেই না হাঁড়গুলো দেখতে গেল তেমনি মানুষের রূপ নিতে ব্যর্থ হয়ে তার মা চড়ুই পাখি হয়ে উড়ে গেল।

দিন কেটে যায়। এক সময় শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রা দুজনেই পূর্ণ যুবতী হয়ে উঠল। একদিন বিকেলে শন্দ্রেম্বী কাঁখে মাটির কলস আর চাইশ্রা পিতলের কলস নিয়ে জল তুলতে নদীর ঘাটে গেল। ঠিক সেই সময় রাজ্যের রাজা দলবল নিয়ে শিকার থেকে ফিরছিল। নদীর ঘাটে অপূর্ব সুন্দরী শন্দ্রেম্বীকে দেখেই রাজা তার প্রেমে পড়ল। তিনি বললেন- 'পিতলের কলস কাঁখে মেয়েটি নয়, আমার পছন্দ মাটির কলস কাঁখে মেয়েটি। এ কথা শুনে চাইশ্রা মনে বড় দুঃখ পেল। ঘরে ফিরেই তার দুঃখের কথা জানাল মাকে। মায়ের ব্যবস্থা মতো পরদিন চাইশ্রাকে মাটির কলস আর শন্দ্রেম্বীকে পিতলের কলস দিয়ে আবার জল তুলতে নদীর ঘাটে পাঠাল। সেদিনও রাজা ঘোড়ার চড়ে নদীর ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। এবার রাজা বললেন- "মাটির কলস কাঁখে মেয়েটি নয়, আমার পছন্দ পিতলেব কলস কাঁখে মেয়েটি।' এ কথা বলেই রাজা শন্দ্রেম্বীকে ঘোড়ায় পিঠে তুলে নিল ও রাজবাড়ির দিকে ছুটে গেল। রাগে অপমানে হাতের কলস ছুড়ে ফেলে দিয়ে চাইশ্রা ঘরে ফিরে গেল এবং মাকে সব ঘটনা জানাল। মা ও মেয়ে দুজনে ঈর্ষায়

জ্বলতে লাগল। ওদিকে রাজার সঙ্গে শন্দ্রেম্বীর ঘটা করে বিয়ে হল। তাকে করা হল রাজ্যের পাটরাণি। আনন্দ ও প্রাচুর্যে তার জীবন কাটতে লাগল। স্বাভাবিক নিয়মে শন্দ্রেম্বীর কোলভরে এলো ফুটফুটে এক ছেলে। এসব খবর পেয়ে চাইশ্রা ও তার মা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরল।

কী করে শন্দ্রেম্বীর ক্ষতি করা যায় এই চিন্তা মা ও মেয়ের ঘুম কেড় নিল। শেষে তারা ফন্দি এঁটে শন্দ্রেম্বীকে বাড়িতে আসার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাল। গয়নাগাটি পড়ে সেজেগুজে পালকিতে চড়ে শন্দ্রেম্বী একাই নিমন্ত্রণ খেতে বাপের বাড়িতে এলো। তার এই সাজ ও রূপ দেখে সৎমা ও সৎবোনের জ্বালা আরো বেড়ে গেল।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর চাইশ্রা আবদার করল, 'দিদি, তোমার পোশাক ও গয়নাগুলো একবার পরে দেখি কেমন মানায় আমাকে।' এ কথা বলে শন্দ্রেম্বী বলল, "চাইশ্রা, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে এবার দাও তো পোশাক ও গয়নাগুলো। শন্দ্রেম্বী এ কথা বলায় চাইশ্রা রাগের ভান করে তোমার পোশাক ও গয়নাগুলো কি একটুও পড়তে পারব না। নাও, নিয়ে যাও। এ কথা বলেই সেগুলো খুলে বিছানার খাটের নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। শন্দ্রেম্বী যেই না হাটু গেড়ে খাটের নীচ থেকে গয়নাগুলো বের করতে গেল অমনি সৎ মা তার গায়ে ফুটন্ত জল ঢেলে তাকে মেরে ফেলল। আর শন্দ্রেম্বীর পোশাক ও গয়নাগুলো পরিয়ে চাইশ্রাকে শন্দ্রেম্বী সাজিয়ে রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিল। ছদ্মবেশী চাইশ্রা রাজার কাছে ঘেষতে সংকোচ বোধ করত। রাজাও চাইশ্রার কুৎসিত চেহারা ও চাল-চলন দেখে সন্দেহ হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল- শন্দ্রেম্বী কি ব্যাপার? এ কদিনের জন্যে বাপের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েই তোর দু পায়ের গোড়ালি ফেটে চৌচির হয়ে গেল, চোখের পাতাগুলো ভিজে জট পেকে গেল। চেহারাও দেখছি বিচ্ছিরি করে ফিরলি। রাজার এ ধরনের সন্দেহমূলক প্রশ্নের জবাবে চাইশ্রা বলল, প্রিয়তম আমার দুধের শিশুটি খিদের জ্বালায় কেঁদে আকুল হয়েছে ভেবে ছুটতে ছুটতে এসেছি। তাই পায়ের গোড়ালি ফেটে গেছে। প্রয়াত বাবা মার কথা মনে পড়ায় বাপের বাড়িতে বড় বেশি কান্নাকাটি করেছি, তাই চোখের পাতা ভিজে জট বেঁধেছে। এই উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হতে না পারলেও আর কথা বাড়াল না।

কিছুদিন পর রাজার এক ঘাসুড়ে যখন মাঠে ঘাস কাটছিল তখন গাছের ডালে বসে বন কবুতরের রূপ ধারণ করা শন্দ্রেম্বী ডেকে ডেকে বলতে লাগল—

কু কু কু শব্দ করে
লেজহীনা ডেকে বলে
শোনো ভাই ঘাসুড়ে
জানিয়ে দেবে সবাইকে
আসল রানী গাছের ডালে
নকল রানী সিংহাসনে
রাজা প্রজার বিপদ হবে
সোনার মালা যাবে ছিড়ে,
ভ্রূবিহীনা মেয়েটি
থাকলে পড়ে রাজার পরে।

ঘাসুড়েটি রাজবাড়িতে ছুটে এসে রাজাকে সব কথা জানাল। রাজা এ কথা শুনে কাল বিলম্ব না করে তার সঙ্গে মাঠে ছুটে গেল আর এক মুঠো চাল হাতের তালুতে ছড়িয়ে রেখে বললেন-

তুমি বড়ই সুন্দরী
বন কবুতর পাখিটি
তুমিই আসল তুমিই খাঁটি,
তুমিই আমার জীবন সাথী।
তবে উড়ে এসো আমার কাছে,
আমার হাতে আধার আছে।

বন কবুতরটি বিনা দ্বিধায় উড়ে এসে রাজার হাতে বসে চাল খেতে লাগল। রাজা বন কবুতরটিকে ধরে খাঁচায় পুরে রেখে দিল। রাতে শন্দ্রেম্বী স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাজাকে বলল- "হে আমার প্রাণেশ্বর আমি এই বন কবুতরের রূপ ধারণ করেছি। কাউকে না জানিয়ে এই বন কবুতরটিকে সাতদিন খাঁচায় রেখে দেবেন। সাতদিনের দিন আমি

আবার আমার রূপ ফিরে পেয়ে আমার সন্তানকে লালন পালন করতে পারি কিনা দেখি।”

খাঁচায় পুরে রাখা বন কবুতরটিকে রাজার শিশুপুত্র প্রতিদিন অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আর খুব খুশি হত। খাঁচার ভেতর আটকে রাখা বন কবুতরটিও অনেক সময় রাজকুমারের চোখের ময়লা ঠোঁটে ঠুকরে পরিস্কার করে দিত। এসব দেখে চাইশ্রার মনে সন্দেহ জাগল। একদিন রাজা দলবল নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লে সেই সুযোগে চাইশ্রা খাঁচায় রাখা বন কবুতরটিকে মেরে এর মাংস রান্না করল। শিকার থেকে ফিরে এসে খেতে বসে কবুতরের মাংস রান্না করেছে দেখে রাজার মনে সন্দেহ হল। রাজার জেরায় চাইশ্রা স্বীকার করল। খাঁচায় রাখা কবুতরটিরই মাংস রান্না হয়েছে। এ কথা শুনে রাজা তো রেগে আগুন। রান্না করা কবুতরর মাংস না খেয়ে পিছ দুয়ারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিছুদিন পর সেখানে একটি আমগাছ গাজিয়ে উঠল।

ক্রমে গাছটি বড় হল এবং গাছে ধরল একটি আম। একদিন রাতে শন্দ্রেম্বী স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাজাকে বলল- “মহারাজ, পিছ দুয়ারের আম গাছটির আম পুষ্ট হলে পেড়ে চালের হাঁড়িতে পাঁচদিন রেখে দেবেন। তা থেকে আমি আবার রূপ ফিরে পাব।” আমটি যাতে কেউ না পারতে পারে তার জন্য রাজা গাছটিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখল। তা দেখে চাইশ্রার মনে সন্দেহ জাগল। একদিন রাজবাড়িতে রাজার ঘাসুড়ে ফল খাওয়ার জন্য ফল খুঁজতে গেলে চাইশ্রা পিছ দুয়ারের আমগাছের আমটিকে দেখিয়ে দিল। ঘাসুড়ে গাছ থেকে আমটি পেড়ে বাড়িতে নিয়ে এলো। খাবার জন্য আমটিকে যেই কাটতে যাবে এমন সময় জরুরী এক কাজে তাকে যেতে হল অন্যত্র। ফিরে এসে খাবে বলে সে আমটিকে চালের হাঁড়ির ভেতর রেখে দিল। কাজ ছেড়ে এসে আম খাবার কথা ভুলেই গেল সে। চার দিনের দিন আমের কথা মনে পড়ায় চালের হাঁড়ি থেকে তা বের করে কাঁটার জন্য দা খুঁজতে গিয়ে কোথাও তা খুঁজে পেল না।এভাবে পাঁচদিন পূর্ণ হয়ে গেলে সেই আম থেকে শন্দ্রেম্বী আবার মানুষ হয়ে জিইয়ে উঠল। ঘাসুড়ে রাজবাড়িতে ছুটে গিয়ে রাজাকে সুখবরটা দিল। খবর পেয়েই রাজা ঘাসুড়ের বাড়ি ছুটে গিয়ে শন্দ্রেম্বীকে রাজবাড়িতে নিয়ে এলেন। অন্যের অনিষ্টকারী চাইশ্রাকে রাজা দিলেন চরম শাস্তি- মৃত্যুদণ্ড। এভাবে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা সয়ে শন্দ্রেম্বী রানীর আসনে বসে রাজার সঙ্গে সুখে আনন্দে

বাকি জীবন কাটালো।”

উপরিউক্ত লোককাহিনিটিতে বিমাতার অত্যাচারের করুণ দৃশ্যই প্রকাশিত হয়েছে। বিমাতা কৌশলে তার সতীনের মুখে সাপ ঢেলে তাকে মেরে ফেলল আর সতীন কন্যা শন্দ্রেম্বীকে যারপর নাই কষ্ট দিতে লাগল। কচ্ছপরূপী শন্দ্রেম্বীর মাকে সে লুকিয়ে জলপাত্রে এনে রাখার পর চাইশ্রার অসৎ আবদারে সায় দিতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেল। তার সৎ বোন চাইশ্রা কচ্ছপটিকে তুলে আনার পর সৎমার আদেশে সে কচ্ছপটিকে রান্না করতে শুরু করল। মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত শন্দ্রেম্বী উনুন থেকে লাকড়ি তুলে নিলেই সৎমা তাকে লাকড়ির ছ্যাঁকা দিত। বাংলা লোককথাটির মতো এই লোককথাটিতেও বিমাতা মেয়েটিকে কচ্ছপরূপী তার মার মাংস খেতে দিয়েছিল। কিন্তু সে তা খেতে পারেনি। রাজার সাথে শন্দ্রেম্বীর বিয়ে হওয়ার হিংসায় বিমাতা ও তার মেয়ে জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল। ফলে দুষ্ট বিমাতা তার ক্ষতি করার জন্য দিন গুনতে লাগল। ঈর্ষাপরায়ণ বিমাতা প্রতিহিংসার বশবর্তী শন্দ্রেম্বীর গায়ে ফুটন্ত জল ঢেলে তাকে মেরে ফেলল। এমনকি রাজার শাস্তির ভয়ও তার ছিল না। এই লোককথাটি বাংলা ‘বড় বউ আর ছোট বউ’ লোককথাটির সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ। লোককথা দুটির গঠনশৈলী প্রায় একই। প্রায় একইধরনের আরেকটি লোককথা ‘দুই রানীর গল্প’ প্রচলিত রয়েছে ডিমাছা সমাজে।

“কোনো একসময় ডিমাছা দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর ছিল দুই রানী। বড় রানীর এক কন্যা আর এক পুত্র। ছোট রানীর শুধু এক কন্যা। এ নিয়ে ছোট রানীর বড় হিংসে। কেমন করে বড় রানীকে সরিয়ে দেওয়া যায় সে সুযোগেই খুঁজছিল ছোট রানী।

একদিন স্নানের সময় সুযোগ বুঝে ছোট রানী বড় রানীকে ঝিলে ঠেলে ফেলে দিল। তারপর মন্ত্রের শক্তিতে তাকে কচ্ছপে রূপান্তর করলো। রাজবাড়িতে ফিরে এসে রটিয়ে দিল বড় রানী পালিয়েছে।

বড় রানী ঝিলে কচ্ছপ হয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হলো। কিন্তু মায়ের মমতা তো আর শেষ হয় না। তাই প্রতিদিন দাসীরা রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে নিয়ে ঝিলের ধারে বেড়াতে এলে বড় রানী তাদের দুধ খাইয়ে পাঠায় সুযোগ বুঝে। তাই তারা সুন্দর সুঠাম দেহ নিয়েই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। ছোট রানী এই রহস্যের কথা একদিন ধরে

ফেলল। সুতরাং আবারও দুষ্টবুদ্ধি প্রয়োগ করতে সে উঠেপড়ে লাগলো।

ছোট রানী অসুস্থ হবার ভান করে বিছানায় ছটফটাতে লাগলো। খবর শুনে ছুটে এলেন রাজা। রাজবদ্যির ডাক পড়ল। কিন্তু ছোট রানী রাজবদ্যির কোন প্রয়োজন নেই বলল। কারণ কচ্ছপের মাংস খেলেই এই ব্যথার উপশম হবে। ছোট রানীর কথা শুনে রানী ঝিল থেকে কচ্ছপ ধরার নির্দেশ দিলেন। অনুচররা ঝিল থেকে কচ্ছপরূপী বড় রানীকেই ধরে আনলে।

রান্নাঘরে কচ্ছপ রান্না শুরু হবার আগেই বড় রানী রাজপুত্র আর রাজকন্যাকে রান্না করা মাংস না খেয়ে সেই মাংস রাজবাড়ির পেছনে মাটিতে পুতে রাখার জন্য বললো।

দু ভাই-বোন তাদের ভাগের মাংস না খেয়ে বাগানে পুঁতে রাখল। সেখানে এক বেলগাছ জন্ম নিল। ভাই-বোন গাছতলায় প্রতিদিন জল দেওয়া, যত্ন নেওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বড় রানীও প্রতি রাতে পুত্র কন্যার কামনায় এসে তাদের আদর যত্নে বড় করে তুলতে লাগল।

রাজপুত্র ও রাজকন্যার হাসি খুশিতে দিন জীবন-যাপনে ছোট রানীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি করলো। সে দুজনের উপর নজর রাখা শুরু করলো। এক রাতে ছোট রানী শুনলো রাজপুত্র-কন্যার কামরায় তারা দুজন ছাড়াও অন্য কেউ যে কথা বলছে। সুতরাং আবারও চক্রান্তে লিপ্ত হলো ছোট রানী। তার কুপরামর্শে রাজা গুপ্তচর নিয়োগ করলেন। একরাতে নিজ পুত্র-কন্যার কামরায় থাকার সময়, রাজার গুপ্তচররা তাকে ধরে ফেললো। হৈ চৈ শুনে রাজা এসে উপস্থিত হলেন পুত্র কন্যার কামরায়। ছুটে এলো ছোট রানী ও রাজা সবকথা জানতে পারলেন। দুষ্কর্মের জন্য ছোট রানীকে বনবাসে দেওয়া হলো।”

অন্য দুটি লোককথার মত এই লোককথার বিমাতাও ঈর্ষা পরায়ণ, অত্যাচারী। বিমাতা ছোট রানী নিজের পুত্র সন্তান নেই বলে হিংসেয় মরে। বাংলা ও মণিপুরি লোককথা দুটির মতই এই লোককথার বিমাতাও কচ্ছপরূপী বড় রানীকে ধরে এনে তার মাংস রান্না করে দুই ভাই বোনকে খেতে দেয়। রান্না করা মাংস মায়ের জেনে তাদের

কষ্ট হওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। দুষ্ট বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিমাতা তার সপত্নী ও তার সন্তানদের নানা রকমের যন্ত্রণা দিতে পিছপা হয়নি। এই লোককথাটিতেও বিমাতার সৎ ছেলে মেয়ের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পরিলক্ষিত হয়।

অসমীয়া লোকসাহিত্যেও অনুরূপ একটি লোককথা প্রচলিত আছে— 'তুলা ও তেজা'। লোককথাটিতে দেখা যায়-

"এক চাষীর দুটি ছিল বউ। ছোট বউটি ছিল তার খুব প্রিয়। বড় বউর ছিল এক মেয়ে নাম তেজা ও এক ছেলে নাম কানাই। আর ছোট বউর ছিল এক মেয়ে নাম তুলা। তুলা বয়সে তেজার থেকে বড় ছিল। ছোট বউ তার সতিনী এবং তার ছেলে-মেয়ের উপর অনেক অত্যাচার করত। ছোট বউ বড় বউ ও তার ছেলে-মেয়েকে সহ্য করতে পারত না। একদিন দুই বউ মিলে গেল মাছ ধরতে। ছোট বউ অনেক ভালো ভালো মাছ পেল। কিন্তু বড় বউ পেল শুধু কাঁকড়া, শামুক ইত্যাদি। ফলে বড় বউয়ের মনে হিংসা আরও বেড়ে গেল। এরপর দুজনে গেল স্নান করতে। ছোট বউ বড় বউকে বলল পিঠ ঘষে দিতে। এবং এরপর সে তার পিঠ ঘষে দেবে। ছোট বউয়ের কথা মত বড় বউ তার পিঠ ঘষে দিল। এরপর ছোট বউ বড় বউয়ের পিঠ ঘষে দিতে লাগল। সুযোগ পেয়ে দুষ্ট ছোট বউ বড় বউকে জলে ফেলে দিয়ে বলল— "বড়, কচ্ছপ হয়ে তুই এই জলে থাক।" আর বড় বউয়ের মাছ নিয়ে একা বাড়ি ফিরে আসল। তেজা আর কানাই নিজের মার কথা জিজ্ঞেস করলে ছোট বউ কঠোরভাবে জানায় যে 'আমি কি করে জানব? তোমাদের মা কি কোথাও যাওয়ার আগে আমাকে বলে যায়?' তারা ময়ের সন্ধান না পেয়ে কাঁদতে থাকে। লোকটিও বড় বউয়ের কোনও সন্ধান করে না।

তেজা আর কানাই জঙ্গলে গরু চড়াতে গেল। জল পিপাসা পাওয়ায় তারা দুজনে সেই জলাশয়ে গেল জলপান করতে যেখানে তাদের মা কচ্ছপ হয়ে আছে। তখন তাদের কচ্ছররূপী মা পারে উঠে এসে নিজের সন্তানদের আদর করতে করতে সব কথা খুলে বলল। বড় বউ তার সন্তানদের বলল 'আমি জলপরীর কাছ থেকে তোমাদের জন্য সুস্বাদু ভাত নিয়ে এসেছি। তোমরা দুটি কচু পাতা নিয়ে আসো'। তাদের আরও বলে দিল যে এই কথাটি যেন তাদের সৎমাকে না বলে। এইভাবে প্রত্যেকদিন খাবার দিতে

লাগল। ছেলে-মেয়ে দুটি সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী হয়ে উঠল। সৎমা তাদের দিন দিন সুন্দর হয়ে যাওয়া দেহ দেখে তার মনে সন্দেহ জাগে। আর তাই একদিন মেয়ে তুলাকে তাদের পিছনে পাঠিয়ে দিল নজর রাখার জন্য। আর তুলার কাছ থেকে ছোট বউ আসল রহস্যটা জেনে নিল। তখন সে অসুস্থ হওয়ার ভান করল এবং একজন বৃদ্ধ স্ত্রী চিকিৎসককে আগে থেকেই বুদ্ধি শিখিয়ে রাখল। বৈদ্য চাষীকে বলল যে কচ্ছপের মাংস খেলেই তার রোগ ভাল হয়ে যাবে। তেজা আর কানাই কথাটি জানতে পেরে কচ্ছপরূপী মাকে গিয়ে সব কথা বলল। মা তাদের খেতে নিষেধ করল ও তার পা এবং হাঁড় নদীর তীরে পুঁতে ফেলতে বলল। তারা সেই রকমই করল।

নদীর ধারে দুটি গাছ উঠল। একটি খুব সুন্দর ফুলের ও অন্যটি অতুলনীয় স্বাদের একটি কমলার। তেজা এবং কানাই গরু চড়াতে গিয়ে সেই গছের নীচে বসে এবং মায়ের সঙ্গে কথা বলে। একদিন রাজা ওই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দুটি গছের উপর নজর পড়ল। সুন্দর কমলালেবু দেখে রাজার খাবার ইচ্ছে হল এবং কয়েকটি ফুল নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে হল। রাজা মন্ত্রীকে পাঠালেন ফুল আর ফল নিয়ে আসার জন্য। মন্ত্রীকে দেখে ভাই-বোন বলল যে রাজা নিজে আসলে তারা ফুল আর ফল দেবে। মন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে রাজা নিজে নেমে আসলেন। কানাই রাজাকে দেখে অনুরোধ করে বলল যে যদি রাজা তার দিদিকে বিয়ে করেন তবেই সে এই গাছগুলির ফুল-ফল রাজাকে দেবে। তেজাব রূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে বিয়ে করলেন। বিয়ের পর তেজা রাজার প্রথম পত্নীর বিষ নজরে পড়ল। সপত্নী বিয়ের প্রথম দিন থেকেই তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হল। কারণ সে সবসময় তার বুড়ো দাসীর কু-পরামর্শে চলত। কিন্তু রাজা তেজাকে ভালবাসত। তেজার সুখী সুন্দর জীবন দেখে তার সৎমা আরও বেশী পরিমানে জ্বলতে লাগল। একদিন সৎমা তেজাকে তার ঘরে আমন্ত্রণ জানাল। কিছুদিন পর দুষ্ট সৎমা তার মাথায় কাঁটা বিধে তাকে ময়না পাখিতে রূপান্তরিত করে ফেলল। সৎমার কুপরামর্শে ওর সৎবোন ওর কাপড় পরে রাজার ঘরে চলে গেল। ময়না পাখিটিও তাকে অনুসরণ করল। তুলা দেখতে অনেকটাই তেজার মত ছিল তাই রাজা তাকে চিনতে পারল না। ময়না পাখি রাজাকে সত্যি কথা বলার অনেক চেষ্টা করল। একদিন রাজা পাখিটিকে লক্ষ করলেন ও তাকে তার কাঁধে এসে বসতে বললেন। ময়না পাখি তাড়াতাড়ি

রাজার কাঁধে এসে বসল। রাজা পাখিটির মাথায় একটি কাঁটা বিঁধা দেখতে পেলেন। কাঁটাটি রাজা টেনে তুলতেই তেজা নিজের রূপ ফিরে গেল।”

এই লোককথাটিতেও বিমাতা চরিত্রের নিষ্ঠুর দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে। অন্য তিনটি লোককথার মত এই লোককথারও বিমাতা কচ্ছপরূপী তার সতীনের মাংস রান্না করে তেজা আর কানাইকে খেতে দেয়। তেজার সুখে বিমাতা খুব বেশী ঈর্ষান্বিত হয়। সে তার ইচ্ছাপূরণের জন্য সপত্নীর সন্তানকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। মাথায় কাঁটা ফুটিয়ে বিমাতা তেজাকে ময়না পাখি করে ফেলে আর নিজের মেয়ে তুলাকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেয়। লোককথাটিতে ঈর্ষান্বিত বিমাতার সপত্নীর সন্তানের প্রতি বিদ্বেষভাবই পরিলক্ষিত হয়েছে। এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকেই বিমাতা যে কোন অত্যাচার করতে পিছপা হয়নি।

উপরে উল্লেখিত চারটি লোককথায় তিন ধরনের নারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়— ১) যুবতী স্ত্রীলোক যেমন মেয়েরা ২) মধ্যবয়স্ক স্ত্রীলোক ঃ মাতা, বিমাতা এবং সপত্নী ৩) বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ঃ স্ত্রী চিকিৎসক, বৃদ্ধ দাসী ইত্যাদি। লোককথাগুলোতে প্রথম চরিত্রদের যেমন যুবতী মেয়ে শন্দ্রেম্বী, তেজা বা অন্যরা মাতা পিতার থেকে ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা পেয়ে থাকে। নতুন বিবাহিত যুবতী স্ত্রীরা তাদের স্বামীর কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। লোককথার দ্বিতীয় চরিত্রের মধ্যে মা চরিত্রটি সবসমই স্নেহ, মায়া, মমতাপূর্ণ, যে নিজ সন্তানের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারে। অপরদিকে বিমাতা ও সপত্নী চরিত্র দুটিকে দেখা যায় ঈর্ষান্বিত, প্রতিহিংসা পরায়ণ, বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন। লোককথাগুলির তৃতীয় চরিত্র স্ত্রী চিকিৎসক বা বৃদ্ধ দাসীকে ভাল ও মন্দ দুই দিককে সমান্তরাল ভাবে রেখে চলতে দেখা যায়। তিন ধরনের নারী চরিত্রের মধ্যে সপত্নী বা বিমাতা চরিত্রটিকে সব চাইতে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী রূপেই দেখানো হয়েছে। লোককথাগুলোতে বিমাতা চরিত্রের মধ্যে ভালো গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি লোককথার বিমাতা চরিত্রটি হচ্ছে মায়ামমতাহীন, ধূর্ত, নিষ্ঠুর প্রকৃতির।

লোককথা স্থায়ী কোন একটি জায়গা বা জনগোষ্ঠীর ফসল নয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এক জায়গার লোককথা অন্য জায়গা বা অন্য জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

বলা যায় যে কোন একটি জনগোষ্ঠীর লোককথার সাথে পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানের লোককথার মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাই বরাক উপত্যকায় প্রচলিত এক জনগোষ্ঠীর লোককথার সাথে অন্য জনগোষ্ঠীর লোককথার আশ্চর্য রকমভাবে মিল দেখা যায়। লোককথাগুলো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কাহিনিগুলোর 'কাঠামোটি' এক কিন্তু কাহিনি এগিয়ে চলার ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। বলা যায় যে এই কথা বা কাহিনিগুলো একই সময়ে সৃষ্টি হয়নি আবার এদের সৃষ্টিকাল নির্ণয় করা ও অনেক কঠিন কাজ। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত বাংলা 'কাঁঠাল পাখির কথা' (লোককথা সংখ্যা-১১) ও নাগা লোককথা 'রঙ বেরঙের পালক' (লোককথা সংখ্যা-৩৭)র সাথে ত্রিপুরার চাকমা লোককথা 'বার্গি পাখির কাহিনি' অদ্ভুত রকম ভাবে মিল পরিলক্ষিত হয়। আবার বরাক উপত্যকার বাংলা লোককথা 'বড় বউ আর ছোট বউ' (লোককথা সংখ্যা-১৪) গল্পের সাথে মণিপুরি 'শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রা', ডিমাছা লোককথা 'দুইরাণীর গল্প' ও অসমীয়া লোককথা 'তেজা ও তুলা'রও মিল রয়েছে। প্রত্যেকটি লোককথারই কাঠামো এক কিন্তু ঘটনা সঞ্চালিত হয়েছে ভিন্ন আবরণে। কিন্তু অন্তরগত মিল ঘটেছে জনগোষ্ঠীগুলির অজ্ঞাতেই। মৌখিক সাহিত্য হওয়ার জন্যই লোককাহিনিগুলোর নানা রূপপরিবর্তন ঘটলেও মূল বিষয়বস্তু একই রয়ে গেছে। বলা যায় যে-

> "যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে চলে আসা লোককাহিনিগুলো নানান পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্দ্ধন হতে হতে অনেকসময়েই তার উৎসরূপ হারায়। কিন্তু তবু তার মূল সূত্র বা দর্শনটি অবিকৃত থাকে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার যে সূত্রটিকে কথকতার কাহিনীর মধ্যে নানান বর্ণে ও অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলেন, তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।" [২৭]

লোকসমাজ কখনও একইরকমভাবে স্থায়ী থাকে না মানুষের অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ, পছন্দ-অপছন্দ নানান সামাজিক অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, কারণে পরিবর্তিত হতে থাকে। তার সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে লোকসাহিত্যগুলোও। বরাক উপত্যকাও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই একই লোককথার অন্তর মিল ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোককথার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাই লোককথাকে এইভাবে দেখানো যেতে পারে।

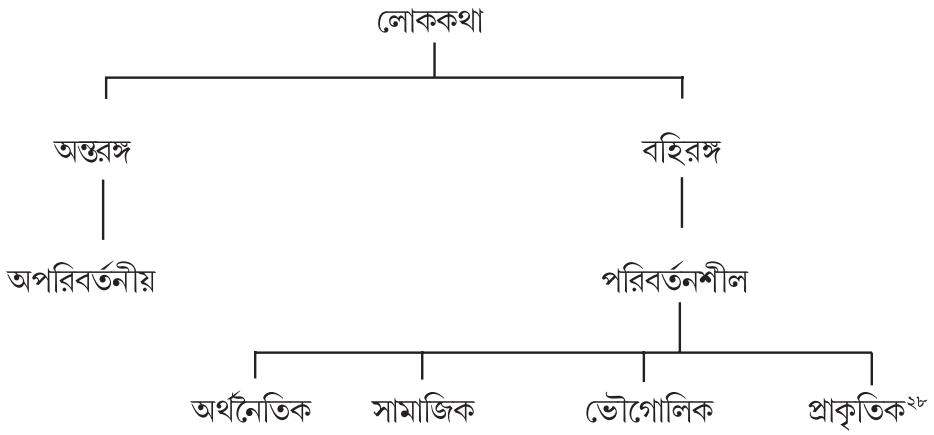

উপরিউক্ত দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রাপ্ত লোককথার সাথে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রাপ্ত লোককথার একটি সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। লোককথা তিনটি হল বাংলা লোককথা, 'কাঁঠাল পাখি' (লোককথা সংখ্যা-১১) নাগা লোককথা 'রঙ বেরঙের পালক' (লোককথা সংখ্যা-৩০) চাকমা লোককথা 'বার্গি পাখির কাহিনি' —

	বাংলা	**নাগা**	**চাকমা**
১।	মূল চরিত্র মেয়ে	মূল চরিত্র ছেলে	মূল চরিত্র মেয়ে।
	তিল পরিস্কার করে	জুমে কাজে যায়	জুমে কাজে যায়।
	মা মারা যাওয়ার পর পিতার দ্বিতীয় বিয়ে	মা মারা যাওয়ার পর পিতার দ্বিতীয় বিয়ে	মাতা ও বিমাতা রেখে পিতার মৃত্যু।
	বিমাতা কর্তৃক অত্যাচারিত সন্তান	বিমাতা কর্তৃক অত্যাচারিত সন্তান	বিমাতা কর্তৃক অত্যাচারিত সন্তান।
	সারাদিন পরিশ্রমের পরও ভাল করে খাবার ও কাপড় না জুটা	সারাদিন পরিশ্রমের পরও ভাল করে খাবার ও কাপড় না জুটা	সারাদিন পরিশ্রমের পরও ভাল করে খাবার ও কাপড় না জুটা।
	রূপ লাবণ্য হারিয়ে ফেলে	রূপ লাবণ্য হারিয়ে ফেলে	রূপ লাবণ্য হারিয়ে ফেলে।
	কাজ করতে করতে কাঁঠাল পাখির ডাক শুনতে পায়। ডাক শুনে পাখি হতে ইচ্ছে হয়।	উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের দেওয়া সুন্দর কাপড়গুলো পড়ে পাখি হতে ইচ্ছে হয়।	বার্গি পাখি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখে পাখি হতে ইচ্ছে হয়।

	ঈশ্বরের কাছে করুণ প্রার্থনা জানায় পাখিতে রূপান্তরিত করে দেবার জন্যে।	বন্ধুদের কাছে তাদের কাপড়গুলো দিয়ে দেবার কথা বলে পাখি হয়ে উড়ে যাবার জন্য।	বার্গি পাখিদের কাছে কাতর প্রার্থনা জানায় তাদের সাথে উড়ে যেতে।
	পাখি হয়ে কাঁঠাল পাকার সময় ডেকে ডেকে সবাইকে জানান দেবে।	সুন্দর পালক বন্ধুর ছেলে মেয়েদের উপহার দেবে।	
	পাখিতে পরিণত হয়ে যায়	পাখিতে পরিণত হয়ে যায়	পাখিতে পরিণত হয়ে যায়।
		পাখি হয়ে প্রতিশোধ নেয়	পাখি হয়ে প্রতিশোধ নেয়।
		পাখিতে পরিণত হওয়ার পর সৎমা হা হুতাশ করে না।	পাখিতে পরিণত হওয়ার পর নিজের মা হা হুতাশ করতে থাকে।
		কয়েকবছর পর পাখিরূপী ছেলেটি গ্রামে উড়ে আসে। আসে।	বৎসরান্তে পাখিরূপী মেয়েটি ঝাঁকবন্দী হয়ে গ্রামে উড়ে
		সৎমার চোখে বিষ্ঠা পড়ায় অন্ধ হয়ে যায়।	সৎমার শরীরে একটি পালক লাগতেই অন্ধ হয়ে যায়।

দেখা যাচ্ছে বাংলা, নাগা ও চাকমা লোককথা তিনটিতেই মিল যেমন রয়েছে তেমনি অমিলও রয়েছে। লোককথা তিনটিতেই বিমাতার অত্যাচারে নিষ্পেশিত সন্তানগুলি পাখি হয়ে উড়ে চলে যেতে চেয়েছে। সৎমায়ের অত্যাচার লোককথার একটি উল্লেখযোগ্য মোটিফ। লোককথায় প্রতিফলিত সৎমায়ের অত্যাচারের যে চিত্র তা বাস্তব জীবনেরই অঙ্গ।

একটি সুস্থ ও সুন্দর জীবন প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য। কিন্তু মানুষ যেরকম চায় জীবন সেরকম হয় না। নানা কারনে জীবন অনেক সময় কষ্টকর হয়ে ওঠে। তখন মানুষ সেই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চায়। যেমন উল্লেখিত এই লোককথা তিনটিতে দেখতে পাওয়া যায় যে সৎ মায়ের জন্য সন্তানদের জীবন যন্ত্রণাময় হয়ে পড়েছিল। যার জন্য

জীবনের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। তাই এই জীবন থেকে তারা মুক্তি পেতে চাইছিল যে কোন উপায়ে। আর দেখা যায় যে পাখি যেমন মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ায় ঠিক তেমনি তিনটি চরিত্রও পাখি হয়ে উড়ে যাওয়ার মধ্যে মুক্তির সন্ধান করেছে।

বরাক উপত্যকার অন্য আরেকটি বাংলা লোককথা 'বড় বউ ও ছোট বউ' (লোককথা সংখ্যা-১৪), মণিপুরি লোককথা 'শন্দ্রেম্বী ও চাইশ্রা', ডিমাছা লোককথা 'দুই রানীর গল্প', অসমীয়া লোককথা, 'তেজা ও তুলা'-র মধ্যেও সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন —

	বাংলা	**মণিপুরি**	**ডিমাছা**	**অসমীয়া**
	একটি লোকের ছিল দুই বউ	এক রাজপারিষদের ছিল দুই বউ	রাজার ছিল দুই রানী	একটি লোকের ছিল দুই বউ।
		অকালে স্বামীর মৃত্যু	স্বামী বর্তমান	স্বামী বর্তমান।
	বড় বউয়ের ছিল এক মেয়ে ও এক ছেলে। ছোট বউয়ের এক মেয়ে।	বড় বউয়ের এক মেয়ে ছোট বউর এক মেয়ে।	বড় রানীর এক মেয়ে আর এক ছেলে। ছোট রানীর এক মেয়ে।	বড় বউয়ের এক মেয়ে ও এক ছেলে ছোট বউর এক মেয়ে।
		বড় বউয়ের মেয়ের নাম শন্দ্রেম্বী ছোট বউয়ের মেয়ের নাম চাইশ্রা		বড় বউয়ের মেয়ের নাম তেজা ও ছেলের নাম কানাই ছোট বউয়ের মেয়ের নাম তুলা।
	বড় বউয়ের মেয়ে অসাধারণ সুন্দরী রূপবতী ও গুণবতী ছোট বউয়ের মেয়ে কালো, কুৎসিত, কর্কশ।	শন্দ্রেম্বী ছিল অপূর্ব চাইশ্রা কুৎসিত ও কুটিল স্বভাবের।		
	বড় বউ ছোট বউ স্নান করতে গেল।	দুই বউ মাছ ধরতে গেল।	দুইরানী স্নান করতে গেল।	দুই বউ মাছ ধরতে গেল।

	ছোট বউ ধাক্কা মেরে বড় বউকে পুকুরে ফেলে দিল।	ছোট বউ বড় বউর মুখে সাপ ঢেলে দিল।	ছোট রানী বড় রানীকে ঝিলে ঠেলে ফেলে দিল	ছোট বউ বড় বউকে জলে ধাক্কা দিয়ে পুকুরে ফেলে দিল।
	জল থেকে উঠতে পারল না পুকুরে কচ্ছপ হয়ে রয়ে গেল।	মারা গেল প্রাণ কচ্ছপ হয়ে বিলের জলে রয়ে গেল।	মন্ত্রের শক্তিতে কচ্ছপে রূপান্তরিত করল।	চিৎকার দিয়ে বলল কচ্ছপ হয়ে তুই জলে থাক।
	কচ্ছপরূপী মা তার সন্তানদের ভাত খেতে দিল।		কচ্ছপরূপী মা দুধ খেতে দেয় সন্তানদের।	কচ্ছপরূপী মা তার সন্তানদের খাবার দিতে লাগল।
	ছোট বউয়ের খাবার সন্তানদের রহস্য বুঝতে পারল।	চাইশ্রা তার মাকে শন্দ্রেম্বীর কচ্ছপরূপী তার মাকে জলপাত্রে এনে রাখার কথা বলল।	ছোট রানী খাবার দেবার রহস্য ধরে ফেলল।	ছোট বউ তার মেয়ে তুলার কাছ থেকে খাবার দেবার কথা জেনে গেল।
		শন্দ্রেম্বী কচ্ছপরূপী মাকে এনে ঘরের জলপাত্রে রাখল।		
	অসুস্থ হবার ভান করল।	চাইশ্রা জলপাত্র থেকে জল খেতে চাইল।	অসুস্থ হবার ভান করল।	অসুস্থ হবার ভান করল।
	বৃদ্ধ চিকিৎসককে দিয়ে বলাল যে কচ্ছপের মাংস খেলে রোগ ভাল হবে।	চাইশ্রা জলপাত্র থেকে জল খাওয়ার সময় কচ্ছপটিতে তুলে আনল।	ছোটরানী নিজেই বললেন কচ্ছপের মাংস খেলে রোগ ভাল হবে। হবে।	বৃদ্ধা চিকিৎসককে দিয়ে বলাল যে কচ্ছপের মাংস খেলে রোগ ভাল
	জেলে দিয়ে কচ্ছপরূপী বড় বউকে তুলে আনল।	শন্দ্রেম্বী কচ্ছপরূপী মাকে তুলে আনল।	অনুচররা কচ্ছপরূপী রানীকে তুলে আনল।	
	বড় বউর মেয়েকে দিয়ে কচ্ছপ রান্না করাল।	বড় বউর মেয়ে শন্দ্রেম্বীকে দিয়ে কচ্ছপ রান্না করাল।	রান্নাঘরে অন্য কেও কচ্ছপ রান্না করেছিল।	

	ছেলে-মেয়ে নিজ থেকেই কচ্ছপরূপী মার মাংস খেতে পারলনা।	শন্দ্রেম্বী নিজে থেকেই মাংস খেতে পারল না।	বড় রানী রাজকন্যা ও রাজপুত্রকে মাংস খেতে বারণ করল।	বড় বউ সন্তানদের মাংস খেতে বারণ করল।
	মাংস পুঁতে ফেলল বাড়ীর পেছন দিকে	হাঁড়গুলো কাপড়ে জড়িয়ে একটি বাক্সে মুখ বন্ধ করে রেখে দিল।	মাংস বাগানে পুঁতে রাখল।	মায়ের কথামত পা ও হাঁড় পুকুর পারে পুঁতে রাখল।
	জন্ম নিল একটি আম গাছ। তাতে একটি আম ধরল।	চড়ুই পাখি হয়ে উড়ে গেল।	জন্ম নিল একটি বেল গাছ।	জন্ম নিল দুটি গাছ। একটি সুন্দর জবা ফুলের অপরটি সুস্বাদু কমলালেবুর।
	পূর্ণ যৌবনা বড় বউয়ের মেয়েকে রাজার বিয়ে।	শন্দ্রেম্বীকে রাজার বিয়ে	------	তেজাকে রাজার বিয়ে।
	বিমাতা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।	বিমাতা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।	----	বিমাতা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে।
	নিজ থেকেই বাপের বাড়ি এল।	নিমন্ত্রণ খেতে বাপের বাপেড় বাড়ি এল।	----	তেজা নিমন্ত্রণে বাপের বাড়ি এল।
	------	ফুটন্ত জল ঢেলে শন্দ্রেম্বীকে মেরে ফেলল।	----	মাথায় কাঁটা ফুটিয়ে দিল।
		শন্দ্রেম্বী বন কবুতরের রূপ ধারণ করল।	----	কাঁটা ফুটিয়ে ময়না পাখি বানিয়ে ফেলল।
	------	রাজা হাতের তালুতে চাল দেওয়ার সাথে সাথে বন কবুতরটি এসে রাজার হাতে বসল।	----	রাজা ময়নাকে তার কাঁধে বসার কথা বলায় সে উড়ে এসে তার কাঁধে বসল।
		চাইশ্রা কবুতরের মাংস রান্না করল।	----	----

	----	পিছদুয়ারে ফেলে দেওয়া কবুতরের মাংস থেকে আমগাছ জন্মাল।	----	----
	আমরূপী মায়ের আদেশে গাছটি থেকে আম পেড়ে ছেলে মেয়ে হাঁড়ির ভেতর ঢুকিয়ে রাখল।	গাছটিতে একটি আম ধরল ঘাসুড়ে তাকে খাবে বলে এনে চালের হাঁড়ির ভেতর রেখে দিল।	-----	-----
	পাঁচদিন পর হাঁড়ির ঢাকনা খুলতেই দেখল তাদের মা নিজ রূপ ফিরে পেয়েছে।	পাঁচদিন পূর্ণ হলে বড় বউয়ের মেয়ে শন্দ্রেম্বী নিজ রূপ ফিরে পেল।	বেলগাছ থেকে বড়রানী রূপ নিয়ে প্রতি রাতে পুত্র-কন্যার কামরায় আসতেন।	ময়না পাখির মাথা থেকে বিধানো কাটা তুলার সাথে সাথে বড় বউর মেয়ে তেজা নিজ রূপ ফিরে পেল।
	ছোট বউ ও তার মেয়েকে রাজা বনবাস দিলেন।	অনিষ্টকারী চাইশ্রাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন।	ছোট রানীকে বনবাস দেওয়া হল।	-------
	চরিত্রগুলোর নাম নেই		চরিত্রগুলোর নাম নেই	সন্তানদের নাম আছে।
	----	চাইশ্রাকে শন্দ্রেম্বীর ছদ্মবেশে রাজার কাছে পাঠানো হল।	----	তুলাকে তেজার ছদ্মবেশে পাঠানো হল রাজার কাছে।
	বড় বউর মেয়ের সতীন ছিল না।	শন্দ্রেম্বীর সতীন ছিল না।	----	তুলার সতীন ছিল।

লোককাহিনি চারটির মূল বিষয় ও চরিত্রগুলোর প্রায় একই রকমের বলে মনে হয়। স্নান করা ও মাছ ধরাকে কেন্দ্র করেই সবকটি লোককথার ছোট বউ বড় বউকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তারপর বড় বউ কচ্ছপে রূপান্তরিত হয়েছে, নয়তো মন্ত্রবলে কচ্ছপে রূপান্তরিত করা হয়েছে, নয় মরে গিয়ে কচ্ছপে পরিণত হয়েছে। ছোট বউ

কোন লোককথাই তার সপত্নীকে সহ্য করতে পারে নি। তারা সপত্নীর সন্তানদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। সবকয়টি লোককথায়ই প্রতিহিংসা পরায়ণ বিমাতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। যে সপত্নীর সন্তানদের ক্ষতি করার জন্য যে কোন ধরনের কাজ করতে পিছপা হয়নি। লোককথাগুলি শেষ পর্যন্ত দেখা যায় বিমাতা ও তাদের মেয়ে চরম শাস্তি পায় ও সপত্নীর সন্তানেরা সুখে ও আনন্দে দিন কাঁটাতে থাকে। অর্থাৎ ভারতীয় আদর্শ অনুযায়ী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয় ঘোষণা।

এছাড়া বরাক উপত্যকায় প্রচলিত ব্রতকথার মধ্যেও বিমাতার অত্যাচারের সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। ব্রত সাধারণত পরিবার, সন্তান, স্বামী প্রভৃতির মঙ্গল কামনায় উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। নারীরা সাধারণত ব্রত করেন স্বামী সৌভাগ্যবতী হওয়ার জন্য। বহুপুত্রের জননী হওয়ার জন্য। সতীনের জ্বালা যাতে ভাগ্যে না জোটে তার জন্য। ব্রতকথার 'মা'কে চিত্রিত করা হয়েছে সন্তান বৎসল ও দয়ালু রূপে। আবার এই ব্রতকথার মধ্যে পাওয়া যায় রাজার সাতরাণী-আইরাণী, সতীন বিদ্বেষ, সতীনের সন্তানের প্রতি হিংসা প্রভৃতি। বিমাতার অত্যাচারের এক সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে বরাক উপত্যকায় প্রচলিত 'কর্মপুরুষের ব্রত' (লোককথা সংখ্যা-৩১) কথাটিতে। ব্রতকথাটিতে দেখা যায় এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর দুই মেয়ে ছিল। ব্রাহ্মণী মারা যাওয়ার পর বড় মেয়ের জোর জবরদস্তিতে ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বিয়ে করে। কিছুদিন যেতে না যেতেই সৎমায়ের অত্যাচার শুরু হয়। ব্রাহ্মণ কাজ থেকে ঘরে আসার সাথে সাথে বিমাতা মেয়েদের বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ করতে থাকে। ব্রাহ্মণ রোজ রোজ দিনের অশান্তি সহ্য করতে না পেরে দু বোনকে বনবাসে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। বাবার সাথে দু বোন যখন গভীর জঙ্গলে এসে পৌঁছল তখন পরিশ্রান্ত হয়ে তারা বাবার পায়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। বাবা চুপি চুপি দু-মেয়ের মাথা তার পা থেকে নামিয়ে জামা কাপরে আলতা মেখে সেখান থেকে চলে যায়। এর পর নানা ঘটনা প্রবাহের মাঝখান দিয়ে কাহিনি এগিয়ে শেষ হয় আবার বাবার সাথে মেয়েদের মিলনের মধ্য দিয়ে। এই কথা বা কাহিনিটিতেও সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ প্রথার ফলে স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার ব্রাহ্মণকে আবার বিয়ে করতে দেখা যায়। আর বিমাতার আগমন ব্রাহ্মণের দুই মেয়ের উপর অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় পত্নীর

যন্ত্রণায় এমন অবস্থা দাঁড়াল যে পিতা তার সন্তানদের বনবাসে দিতেও পিছপা হলেন না। বিমাতার নিষ্ঠুর মনোভাবের জন্যই পিতাকে এমন পথ বেছে নিতে হয়েছিল। বিমাতার আগমনে ব্রাহ্মণ ও মেয়ে দুটির জীবনে নিত্য অশান্তি লেগেই ছিল, 'কর্ম' পুরুষের এই ব্রতকথাটির মাধ্যমে বিমাতা নিষ্ঠুর ছবিটিই পরিলক্ষিত হয়েছে। বরাক উপত্যকার প্রচলিত কর্ম পুরুষের আরেকটি ব্রতকথায়ও একই রকমভাবে বিমাতার বৈমাত্রীসুলভ আচরণের ছবি ফুটে উঠেছে (লোককথা সংখ্যা -২৮)। ব্রতকথার কাহিনিটিতে দেখা যায় এক ব্রাহ্মণের ছিল দুই মেয়ে। দুই মেয়ে বাবাকে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবে। কারণ তাদের মা নেই। মাতৃহারা মেয়ে দুটি বাবাকে বিয়ে দিয়ে মায়ের অভাব পূরণ করতে চায়। নানা ঘটনার পর ব্রাহ্মণের বিয়ে হল রাজ কন্যার সাথে। ব্রাহ্মণের সুখের সংসার হল। কিন্তু সুখের সংসারে আগুণ ধরাল মাছ বিক্রী করতে আসা এক মাছুনী। মাছ কিনতে গিয়ে ব্রাহ্মণ পত্নী যখন মাছুনীকে বলল যে সে মেয়েদের জিজ্ঞেস করে মাছ কিনবে তখন মাছুনী বলল যে আজকাল কেউ নিজের পেটের সন্তানকেই জিজ্ঞেস করে না আর সে সৎ সন্তানরে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে। এর সাথে মাছুনী তাকে এও বলল যে মেয়ে দুটিকে বনবাসে দিতে। দুষ্ট মাছুনীর কথা বিমাতার মনে গিয়ে লাগল, সে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে লাগল। সে ব্রাহ্মণের সাথে পরামর্শ করে মেয়ে দুটিকে বনবাসে দিল। মাছুনীর মত শয়তান চরিত্রের নারীর কুপরামর্শে বিমাতার মন বিষিয়ে গেল। বনবাসে পাঠানোর মত কঠোর সিদ্ধান্ত তার স্বামীকে দিয়ে নেওয়াতে সে পিছপা হল না। এই ব্রতকথাটিতেও সৎমায়ের বৈমাতৃসুলভ আচরণের কথাই পরিস্ফুট হয়েছে।

লোককথা হচ্ছে মানব জীবনের দলিল। কোন একটি জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনা, বিশ্বাস সংস্কারের ছবি লোককথাগুলোতে ফুটে উঠেছে। বরাক উপত্যকার গোষ্ঠী জীবন ও গোষ্ঠী মানসও এর ব্যতিক্রম নয়। বরাক উপত্যকার বৈচিত্রময় আচার-সংস্কার-চিন্তাধারা প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু কিছু সমস্যা আছে যা প্রত্যেকের জীবনেই একই রকমের। এমনই একটি সমস্যা হচ্ছে সতীন দ্বন্দ্ব আর বিমাতার সপত্নীর সন্তানদের প্রতি অত্যাচার। সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ কৌলিন্য প্রথার বিষময় ফল এই সমস্যা। বরাক উপত্যকায় প্রচলিত

লোককথাগুলিতে এরই জীবন্ত প্রতিফলন ঘটেছে। দুই সতীন ঘরে থাকলে সাংসারিক জীবনে অশান্তি ও বিষন্নতার সৃষ্টি হয়। যার ভুক্তভোগী হয় সন্তানেরা। সন্তানের প্রতি দেখা যায় চরম অবহেলা ও অত্যাচার যেমন খেতে না দেওয়া, অতিরিক্ত কাজ করানো প্রভৃতি। চলে অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এমনকি প্রতিহিংসা পরায়ণ বিমাতার অত্যাচার এত চরমে পৌঁছায় যে সে সন্তানকে প্রাণে মেরে ফেলতেও দ্বিধা বোধ করে না। পুরুষশাসিত সমাজের বিষময় দিকটি বিভিন্ন প্রচলিত লোককথার মাধ্যমে ফুটে উঠতে দেখা যায়।

এক পুরুষের অনেকগুলো স্ত্রী ও তাদেরকে ঘিরে রয়েছে সন্তানেরা। সতীনের প্রতি সতীনের বিদ্বেষ ও তার পুত্র-কন্যার প্রতি করা নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনি লোককথার জগতে প্রচুর রয়েছে। 'মা' বলতে সাধারণত আমরা সন্তানবৎসল, শান্ত, মায়ামমতায় পরিপূর্ণ এক নারীকে বুঝি, যে নিজ সন্তানকে মৃত্যুর মুখ থেকেও ফিরিয়ে আনতে পারে। দেবীকে সামনে পেয়ে তাই বর প্রার্থনা করে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। সন্তানের সুখের জন্য মা সমস্ত ধরনের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেও প্রস্তুত। কিন্তু অপরদিকে সৎ মায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। নিজের সন্তানকে মন-প্রাণ দিয়ে স্নেহ করলেও সপত্নীর সন্তানদের ক্ষেত্রে তার নজর ভিন্ন হয়ে যায়। আলোচ্য লোককথাগুলোতে সতীনের প্রতি হিংসা এবং বিমাতার অকথ্য, অত্যাচার, নির্যাতন, প্রতিহিংসার বিদ্বেষপূর্ণ নিষ্ঠুর ছবিই দেখতে পাওয়া যায়। যা সমাজ জীবনের এক রূঢ় বাস্তব চিত্র। মা এবং বিমাতার পার্থক্যটাকে এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

সতীনের সঙ্গে যখন কোন একজন নারীকে ঘর করতে হয় তখন নিরাপত্তাহীনতা ও অস্তিত্ব সংকটের ভয় তাকে তাড়া করে। তার মধ্যে অধিকার বোধ খুব সক্রিয় হয়ে উঠে। এর ফলে সে হয়ে ওঠে নির্মম আর অত্যাচারী। যে কোন উপায়ে সতীন নামক কাটাকে জীবন থেকে একেবারে দূর করতে চায়। সপত্নীর প্রতি হিংসা থেকেই সপত্নীর

সন্তানের প্রতিও সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রতি অত্যাচার করে। পারিবারিক জীবনে এই সমস্যাটি লোককথায় ধরা পড়েছে খুব সহজ-সরল ও সুন্দরভাবে। অন্যান্য অঞ্চলের লোককথার মত বরাক উপত্যকার প্রচলিত লোককথায়ও সতীন দ্বন্দ্ব এবং বিমাতার অত্যাচারের চিত্রটি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ইসলাম, নজরুল, সঞ্চিতা, ('নারী'), ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, একবিসপ্তিতম সংস্করণ, ২০০৮, পৃঃ ৭৮।

২. সিদ্দিকী, আসরাফ, লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, পৃঃ ১৬৬।

৩. তদেব, পৃঃ ১৬৮।

৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঃ লোকসাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, অগ্রহায়ণ, ১৪১১ পৃঃ ৩৩।

৫. প্রচলিত প্রবাদ।

৬. ঐ ।

৭. ঐ ।

৮. ঐ ।

৯. চক্রবর্তী, ড° বরুণকুমার (সম্পাদিত) ঃ ধাঁধা স্বরূপ সন্ধান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৬৬।

১০. তদেব, পৃঃ ১৬৬।

১১. মণ্ডল, ড. কাকলী ধারা (সম্পাদিত): বাংলা লোকসঙ্গীত কোষ, অমর ভারতী, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, পৃঃ ১৪৫।

১২. তদেব, পৃঃ ৩২৭।

১৩. সিদ্দিকী, আসরাফ, লোকসাহিত্য, প্রথম খণ্ড, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৮, পৃঃ ১৭০।

১৪. চক্রবর্তী, ড° বরুণকুমার (সম্পাদিত) ঃ ধাঁধা স্বরূপ সন্ধান, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০০৮, পৃষ্ঠা- ১৬৪।

১৫. সাহা, লক্ষী ঃ বাংলা লোকসাহিত্যে স্বজন সম্পর্ক, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১ম প্রকাশ, ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩৩।

১৬. প্রচলিত প্রবাদ।

১৭. ঐ ।

১৮. আন্তর্জাল।

১৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত): কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, ৫ম মুদ্রণ ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১১৭।

২০. মজুমদার, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন, দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০০, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩১।

২১. তদেব, পৃঃ ৩৫।

২২. তদেব, পৃঃ ৬৫।

২৩. দাস, ড. নির্মল (সম্পাদিত) ঃ ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা, বুকওয়ার্ল্ড, আগরতলা, ১ম প্রকাশ, ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১২৫।

২৪. সিংহ, এল বীরমঙ্গল : মণিপুরি লোককথা (ফুঙ্গাওয়ারী), অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ১ম প্রকাশ, ২০১২, পৃষ্ঠা- ৬৫।

২৫. তাপাদার, জাহিদ আহমদ, সবুদ দেশের লোককথা, ভাষা সংস্কৃতি অসম, হাফলং, ১ম প্রকাশ, ২০০৬, পৃঃ ২৫।

২৬. বেজবরুয়া, লক্ষীনাথ ঃ বুঢ়ী আইর সাধু, আঁক-বাক, গুয়াহাটি, ২০১১, পৃষ্ঠা- ৬৭।

২৭. চক্রবর্তী, ড০ বরুণকুমার (সম্পাদিত) ঃ লোককথার সাতকাহন, অপর্ণা বুক ডিস্টিবিউটার্স, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০১১, পৃষ্ঠা- ৩৩৭।

২৮. তদেব, পৃঃ ৩৩৯।